রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

কথা ও কাহিনী

সূচনা

একদিন এল যখন আর-একটা ধারা, বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছু দিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্যভূগোলে আর-একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

এ-সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো একটা প্রান্তে উদ্‌বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্‌দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।

কথা

উৎসর্গ

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য
করকমলেষু

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও!
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

রবীন্দ্রনাথ
আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে

কথা

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

অবদানশতক

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

'প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি'
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন
প্রাসাদে।
বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান
এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি 'হে নিদ্রিত পুর,
দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর'—
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই স্বর
শিহরে।
সাধু কহে, 'শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্মমাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।'

কৈলাসশিখর হতে-দূরাগত
ভৈরবের মহাসংগীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।
রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্য ধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।
যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর
মনে হল তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা।
বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহলভরে
নেহারি।
'জাগো, ভিক্ষা দাও' সবে ডাকি ডাকি
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারি।
ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতনকণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে,
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে—
ভিক্ষু কহে, 'ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো গো।'
বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি,

সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—
‘ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।’
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।
দীন নারী এক ভূতলশয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
ভিক্ষু উর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ,
কহে, ‘ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।’
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-
আলোকে।

৫ কার্তিক ১৩০৪

প্রতিনিধি

অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভাগোয়া ঝণ্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সব যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, 'দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।'
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
'গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।'

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ!
'হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—

মোরে তুমি হে ভিখারি, মার কাছ হতে কাড়ি,
করেছ আপন অনুচর।'

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, 'পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব গুণী?'
'তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান'
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, 'এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।'

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্য তরে, তাঁর ভিখারির ব্রত!
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,
'ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।'

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, 'নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক—
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু কাছে লব গুরু দুখ।'

গুরু কহে, 'তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

'বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো'
কহিলেন গুরু রামদাস।

নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখালবেণু গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,
'আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসারমাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস!
হে রাজা, রেখেছি আনি, তোমারি পাদুকাখানি
আমি থাকি পাদপীঠতলে—
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই!
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।'

৬ কার্তিক ১৩০৪

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষদ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী

নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে ; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।'
হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
'ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর।'
শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তাঁরে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।'
বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেল চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া। পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা

পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে,
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার ?'
শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।

আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,
'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন ?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো— সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি, বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

৭ ফাল্গুন ১৩০১

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—

'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে !
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি !
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি ।'
কহিলা, 'সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো ।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো !'
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে ।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ-মাঝে,
'ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে ।'

সকলে কাঁদি বলে, 'দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে !
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্মের পানে !'
'আমরা হইলাম পিতৃহারা'
কাঁদিয়া কহে দশ দিক
'সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্ !'
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি,
'নগরে কেন এত শোক !

আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এইমতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগরমাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।'
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত ;
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে,
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,
'কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?'
শুনিয়া রাজা কহে, 'অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে !'
পথিক কহে, 'আমি বণিকজাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি !
করুণাপারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারি ধারে,

অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।'
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,
'পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ ;
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।'

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে ;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
'হেথায় আগমন কিসের কাজে'
নৃপতি শুধাইল হেসে।
'কোশলরাজ আমি বনভবন'
কহিলা বনবাসী ধীরে,
'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল ;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেকতরে
হাসিয়া কহে, 'ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—

রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
　　হৃদয় দিব তারি সনে।’
জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
　　বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
　　ধন্য কহে পুরজনে।

২১ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনী

অবদানশতক

　　নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
　　পদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
　　শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
　　রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
　　কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
　　পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে—

সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।'

সেদিন শারদদিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
'এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সেজনা
অথবা নির্বাসনে?'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—

কহিল, ‘অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা ! এখনি যা চলে ।
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদ্‌পাত ।’

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী—
চাহিয়া দেখিল দ্বারে ।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে ।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,
‘রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক’রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে !’

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি ।
‘হে পুরবাসিনী’ সবে ডাকি কয়
‘হয়েছে প্রভুর পূজার সময়’—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি ।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-’পরে ।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ—

আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়ঘরে।

শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান'
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিল চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি!'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী।'

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে!
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ—
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দুসমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।'

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।

জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে—
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসাররাত্রি?

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীরপ্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
তাঁহার চরণোপান্তে!

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ!
রোগমসীঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দনপঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা!'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্তুবদান

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে!' রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে— তাহারে ধরিল চোর বলি।
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি; নয়নসম্মুখে
স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি!

মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে ! শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্‌ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
এক বার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি !' শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহমাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ ! চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে। সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
'একি লীলা, হে সুন্দরী, একি তব লীলা !
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান !' শুনি শ্যামা কহে,
'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে,
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে ; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।'
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে
'আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।' কহিল প্রহরী,
'তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,

এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।' ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, 'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন—
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে,
'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে
করধৃতশুকতারা শুভ্র উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুর নগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী!'

'আমি দয়াময়ী!' রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর!'
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে,
পূর্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
'হে বিদেশী, এসো এসো' কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, 'হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু!' নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসব-গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল, 'কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।' আলিঙ্গন ঘনতর করি
'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণস্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে; জনপদবাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন।

পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণপ্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়,
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিক-শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।' বস্ত্র টানি মুখ'পরি,
'সে কথা এখনো নহে' কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রের মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, 'প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,

সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব;
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো।—
বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।'

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি; মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা; মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, 'ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'

চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, 'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল! এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত! কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী!
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।'
এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে। ঘনগুল্মগন্ধপুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকা বাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার।
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে। কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম! সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ করে
গর্জিল পথিক, 'তবু ছাড়িবি না মোরে!'
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার; আর্দ্রগদ্‌গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় 'ছাড়িব না' 'ছাড়িব না'

কহে বারম্বার, 'তোমা লাগি পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।'
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর, তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে 'কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।' দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার

শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।
শুক্ল পঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন 'এসো এসো প্রিয়া'
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম।
'এসো এসো প্রিয়া!' 'আসিয়াছি প্রিয়তম!'
চরণে পড়িল শ্যামা, 'ক্ষম মোরে ক্ষম!
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে!' শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ'পরে,
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি,
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি—
গরজিল, 'কেন এলি, কেন ফিরে এলি!'
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!' নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে

প্রণমিল, তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

সামান্য ক্ষতি

দিব্যাবদানমালা

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শতসখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে ক'টি আছিল কুটীর
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখির
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে—
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, 'উহু! শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি,
জেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।'

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য আননে—

'ওলো তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল'
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি,
'এ কি পরিহাস রানীমা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি?

এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।'

রানী কহে রোষে, 'দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে।'
অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হুহু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী।
ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।

প্রভাতপাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল—
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে
দীপ্ত অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া মিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিমমুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, 'মহিষী, একি ব্যবহার!
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজধরমে!'

রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
'গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!'

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—

'যতদিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।'

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া—
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পার সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।'

২৫ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতক

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া—
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল এক জন,
'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার?
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধদরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্ স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণীস্বামী,
'বিশ মাষা দিব' পান্থ কয়।
দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত !
কহিল সে করজোড়ে, 'দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।'

২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা ?'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি, 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী!'

কহিল সামন্ত জয়সেন,
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ!'

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কী কব, এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন—
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি ছুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।

কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী!
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এহেন কঠিন গুরু কাজ!
কী আছে তোমার কহো আজ।'

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

২৭ আশ্বিন ১৩০৬

অপমান-বর

ভক্তমাল

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।

কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড়করে,
'দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে—
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
একি কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি।
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি !'

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি—
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধুলার লাগি !
চারি পোওয়া কলি পুরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা।
ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে—
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে।
কহিল, 'রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারো কাছে—
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে !
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো !'

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ,
'ভণ্ডতাপস, ধর্মের নামে করিছ ধর্মলোপ !
তুমি সুখে ব'সে ধুলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্নশোকে !'
কহিল কবীর 'অপরাধী আমি, ঘরে এসো নারী তবে—
আমার অন্ন রাহতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে ?'

দুষ্টা নারীরে আনি গৃহমাঝে বিনয়ে আদর করি
কবীর কহিল, 'দীনের ভবনে তোমারে পাঠালো হরি।'

কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,
'লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।'
কহিল কবীর, 'ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ—
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ।'

ঘুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান—
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণগান।
রটি গেল দেশে— কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির, 'আমি সকলের নীচে।
যদি কূল পাই তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু—
তুমি যদি থাক আমার উপরে আমি রব সব-নিচু।'

রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা।
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, 'থাকি সবা হতে দূরে আপন হীনতা-মাঝে;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে!'
দূত কহে, 'তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ,
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।'

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি—
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী।
কেহ হাসে কেহ করে ভ্রূকুটি, কেহ রহে নতশিরে,
রাজা ভাবে— এটা কেমন নিলাজ রমণী লইয়া ফিরে!
ইঙ্গিতে তাঁর সাধুরে সভার বাহির করিল দ্বারী,
বিনয়ে কবীর চলিল কুটিরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কৌতুকভরে হাসে,
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রূপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, 'পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে!
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান।'
কহিল কবীর, 'জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।'

২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ

ভক্তমাল

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
নির্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন-মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজ গানে।
হেরিলেন মৃত পতি-চরণের তলে
বসিয়াছে সতী,
তারি সনে একসাথে এক চিতানলে
মরিবারে মতি।
সঙ্গীগণ মাঝে মাঝে আনন্দচীৎকারে
করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি চারি ধারে
গাহে সাধুবাদ।

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে
করিয়া প্রণতি
কহিল বিনয়ে, 'প্রভো, আপন শ্রীমুখে
দেহো অনুমতি।'
তুলসী কহিল, 'মাতঃ, যাবে কোন্‌খানে,
এত আয়োজন!'
সতী কহে, 'পতিসহ যাব স্বর্গপানে
করিয়াছি মন।'
'ধরা ছাড়ি কেন নারী, স্বর্গ চাহ তুমি'
সাধু হাসি কহে—
'হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে?'

বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
বিস্ময়ে অবাক্—
কহে করজোড় করি, 'স্বামী যদি পাই
স্বর্গ দূরে থাক্।'
তুলসী কহিল হাসি, 'ফিরে চলো ঘরে,
কহিতেছি আমি
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
আপনার স্বামী।'
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায়
শ্মশান তেয়াগি—
তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায়
রহিলেন জাগি।

নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্জন ভবনে—
তুলসী প্রত্যহ
কী তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।
এক মাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে
আসি তার দ্বারে
শুধাইল, 'পেলে স্বামী?' নারী হাসি বলে,
'পেয়েছি তাঁহারে।'
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, 'কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে।'
নারী কহে, 'রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।'

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, 'কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর?'
বিপ্র কহে, 'কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহুদুর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে—
এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
পুরিবে প্রার্থনা!,
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়!
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।'
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
'কী আছে আমার!

যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি—
ভিক্ষামাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
'ঠিক বটে ঠিক।
এক দিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে—
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে!
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

'অলখ নিরঞ্জন'
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন্।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
'অলখ নিরঞ্জন!'

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লিপ্রাসাদকূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে!

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো
পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুইজনা দুইজনে।
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
'দীন্ দীন্' গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরানি সেনার করে,

সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লিনগর-'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় 'গুরুজীর জয়'
পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লিপথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহ শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে।

কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।'
দিল তার কোলে ফেলে
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণ পাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি।

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে কানে কয়,
'রে পুত্র, ভয় নাহি।'
নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি
'গুরুজীর জয়! কিছু নাহি ভয়'
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক
লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

৩০ কার্তিক ১৩০৬

মানী

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান
মারবপতি কহিলা আসি,
'করহ প্রভু অবধান,
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান।
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে
আদেশ মোরে করো দান।'

শুনিয়া কহে আরঙজেব,
'কী কথা শুনি অদ্ভুত!
এতদিনে কি পড়িল ধরা
অশনিভরা বিদ্যুৎ?
পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত
মরুভূমির মরীচি-মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত!

দেখিতে চাহি, আনিতে তারে
　　পাঠাও কোনো রাজদূত।'

মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত
　　কহিলা তবে জোড়কর,
'ক্ষত্রকুলসিংহশিশু
　　লয়েছে আজি মোর ঘর—
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান,
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোনো অসম্মান
　　হবে না কভু তাঁর 'পর।
সভায় তবে আপনি তাঁরে
　　আনিব করি সমাদর।'

আরঙজেব কহিলা হাসি,
　　'কেমন কথা কহ আজ!
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
　　মাড়োয়াপতি মহারাজ।
তোমার মুখে এমন বাণী,
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি
　　মানীরে শোভে হেন কাজ?
কহিনু আমি. চিন্তা নাহি,
　　আনহ তাঁরে সভামাঝ।'

সিরোহিপতি সভায় আসে
　　মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চশির উচ্চে রাখি
　　সমুখে করে আঁখিপাত।

কহিল সবে বজ্রনাদে
'সেলাম করো বাদশাজাদে'—
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,
'গুরুজনের চরণ ছাড়া
করি নে কারে প্রণিপাত।'

কহিলা রোষে রক্ত-আঁখি
বাদশাহের অনুচর,
'শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।'
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
'এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি,
জানি নে কভু ভয় ডর।'
এতেক বলি দাঁড়ালো রাজা
কৃপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজপাশ—
কহিলা, 'বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ?'
কহিলা রাজা, 'অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।'
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, 'অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস।'

১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।
নবাব কহিল, 'শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।'
তরুসিং কহে, 'মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই?'
নবাব কহিল, 'মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ—
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।'
তরুসিং কহে, 'করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার

রাজস্থান

বিপ্র কহে, 'রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে,
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ-তরে।

বেঁধেছি তারে, এখন কহো
চোরে কী দিব সাজা।'
'মৃত্যু' শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত,
'চোর সে যুবরাজ—
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে,
কাটিল প্রাতে আজ।
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে,
কী তারে দিব সাজা?'
'মুক্তি দাও' কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা।

৪ কার্তিক ১৩০৬

গুরু গোবিন্দ

'বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে
এখনো সময় নয়'—
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা, বন সুগভীর,
গুরু গোবিন্দ কহিল ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।

'যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
সাহু, ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে—
এখনো পড়িয়া থাক্‌ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

'ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানবসাগর অগাধ
চির-ক্রন্দিত-ঊর্মি-নিনাদ,
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

'মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠি বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

'তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্পসমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্ ঝন্।

'হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে

আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

'সমুখে যে আসে, সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

'শত বার করে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

'কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারি-দিক-ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়,
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

' 'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।

'সিন্ধুমাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,

আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

'কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

'যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

'থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গনি গনি
অনিমেষ চোখে পূর্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

'এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

'একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গমগিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

'এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে!
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।'

'হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে

তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

'ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘন ঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে—
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে
দিবে সবে চির জ্যোতি।

'যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এস দেখি সবে যাবার সময়
বলো দেখি সবে 'গুরুজীর জয়',
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'।'

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

শেষ শিক্ষা

এক দিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা; যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিল দেখা

যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে একি ভুল!
তবে কি জীবন ব্যর্থ! দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, 'যাব চলি দেশে,
ঘোড়া-যে কিনেছ তুমি দাও তার দাম।'
কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজী, সেলাম,
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই।'
পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত—
চোর বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, 'বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।'

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত

আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, 'একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর, তার স্বভাব কি ফেরে?
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।'
গুরু কহে, 'তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে?'

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন— সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠানতনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজীর। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
'শিক্ষা মোর শেষ হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজ ভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।'
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
'আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।'

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা ; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
'অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।' ভক্তদল
'সঙ্গে যাব' 'সঙ্গে যাব' করে কোলাহল—
গুরু কন, 'যাও সবে ফিরে।'

দুই জনে
কথা নাই ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু ; পাঠান দাঁড়ালো।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিমপ্রান্তরপারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
'মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
'পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার— পিতৃঘাতকেরে বধি

উষ্ণ রক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।' বাঘের মতন
হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে ; গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান।
কহিল, 'হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত ; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে। প্রভু, দেহো
পদধূলি।' এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিল শতরঞ্চ খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁটশিরে

পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু; কহে অট্টহাসি,
'পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার!'
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, 'এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু— আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।'

৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়

রাজস্থান

'জলস্পর্শ করব না আর'
চিতোর-রানার পণ,
'বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।'
'কী প্রতিজ্ঞা! হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধবে তা আজ'
কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, 'সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।'

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন তিনেক দূর।

সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সত্ত প্রমাণ রানা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
'আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী!'
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য
হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনুক তীর।
খবর পেয়ে কহে, 'কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির!
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।'

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রানা মহারাজ।
'দূরে রহো' কহে কুম্ভ,
গর্জে যেন বাজ—
'বুঁদির নামে করবে খেলা
সইব না সেই অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।'
কহে কুম্ভ, 'দূরে রহো
রানা মহারাজ।'

ভূমির 'পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলাঘরের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

৭ কার্তিক ১৩০৬

হোরিখেলা

রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁ'রে
কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী—

'লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা ?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।'
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
কেতুন হতে পত্র দিল রানী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে—
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী,
কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুন্‌গুনিয়ে আপন-মনে-মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান-সেনা হোরি খেলতে এল।

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মুলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি—
এল তখন এক-শো রানীর দাসী
রাজপুতানী করতে হোরিখেলা।

রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
 সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
 ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।
ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি,
বামহস্তে গুলাব-ভরা ঝারি—
 সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
 ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
 কেসর তবে কহে কাছে আসি,
'বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি,
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি!'
শুনে রানীর শতেক সহচরী
 হঠাৎ সবে উঠল অট্টহাসি।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
 রঙ্গভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
 উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে—
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
 রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
 লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
 মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।

বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না!
চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।

পাঠান কহে, 'রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা!
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত—
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা।'
পাঠান ভাবে দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

তান ধরিয়া ইমন-ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রানী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন-ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুততালে।

কেসর কহে, 'তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা!'
রানী কহে, 'আমারো সেই দশা।'
এক-শো সখী হাসিয়া বিবশা—
পাঠান-পতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা।

রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠান-পতির চক্ষু হল কানা।

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরু-তলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারী-সজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে এক-শো সাপের মতো।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

৯ কার্তিক ১৩০৬

বিবাহ

রাজস্থান

প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু,
ঘন ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বরকন্যা যেন ছবির মতো
আঁচল-বাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,
জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বর্ষারাতে মেঘের গুরুগুরু—
তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে—
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে,
বাহির-দ্বারে বেজে উঠল ভেরী!
চমকে ওঠে সভার যত লোকে,
উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মেত্রিরাজকুমারে
কহে তখন মাড়োয়ারের দূত,
'যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে—
তোমরা এসো তাঁরি নিমন্ত্রণে
যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত।'
'জয় রানা রাম সিঙের জয়'
গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

'জয় রানা রাম সিঙের জয়'
মৈত্রিপতি উর্ধ্বস্বরে কয়।
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছলো ছলো করে—
বরযাত্রী হাঁকে সমস্বরে,
'জয় রানা রাম সিঙের জয়।'
'সময় নাহি মৈত্রিরাজকুমার'
মহারানার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ!
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর—
কহে, 'প্রিয়ে, নিলেম অবসর,
এসেছে ওই মৃত্যুসভার ডাক।'
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিন মুখে নম্র নতশিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে,
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা, টোপর-পরা শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, 'বধূবেশ
খুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী!'
শান্তমুখে কন্যা কহে মায়ে,
'কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে,

বধূসজ্জা থাক্ মা, আমার গায়ে—
মৈত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।'
শুনে মাতা কপালে কর হানি
কেঁদে কহেন, 'হায় রে হতভাগী!'

গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি
ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দোলা'পরে,
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী কিংকরে
সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মৈত্রিপুরদ্বারে!
'থামাও বাঁশি' কহে, 'থামাও বাঁশি—
চতুর্দোলা নামাও রে দাসদাসী।
মিলেছি আজ মৈত্রিপুরবাসী
মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মৈত্রিরাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে?'

'বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি'
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।
এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর,
শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।
'বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি'
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে
নিশীথ-রাতে মিলনসজ্জা-পরা
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।

ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত 'ধন্য সুচরিতা',
গাহিছে ভাট 'ধন্য মৃত্যুজিতা',
ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি ওঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা॥

১১ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন -প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওআর্থ সাহেব -প্রণীত Ballads of the Marathas -নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও,
পেশোয়া-নৃপতি বংশ,
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
'হরণ করিব ভার পৃথিবীর—

মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।'

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরি হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকালো প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়কোলাহলে—
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য!

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানালো পরম দৈন্য?
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য?

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে
 ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি, 'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও,
 না লয়ে পাপের শাস্তি?'

নীরব হইল জয়কোলাহল,
 নীরব সমরবাদ্য।
'প্রভু, কেন আজি' কহে রঘুনাথ,
'অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ!
চলেছি করিতে যবননিপাত
 জোগাতে যমের খাদ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'বধিয়াছ তুমি
 আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
 ন্যায়ের বিধানসূত্রে।'

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
 কহিলা করিয়া হাস্য,
'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে—
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
 ন্যায়-বিধানের ভাষ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'রঘুনাথ রাও,
 যাও করো গিয়ে যুদ্ধ!

আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই,
করো করো সবে সাজ'
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু'পহরে যে যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা
মারাঠি অশ্বখুরে।

'মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন'
গর্জিলা দুমরাজ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
'বৃথা এ সৈন্যসাজ,
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র
দুর্গেশ দুমরাজ!
সিন্দে আসিছে সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি,
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে—
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে।'
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ'
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা,
'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।'
রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।

'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ!'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমর-সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান,
ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ— প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

কাহিনী

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
      বাহিয়া চেতনাবাহিনী,
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
      তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
      ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী!

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
      ওগো হৃদয়ের গেহিনী!
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুমি তাই ল'য়ে বিরামবিহীন
      রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কী যে কর কাজ
      ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী!

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
      হৃদিশতদলশায়িনী!
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে,
কী যে আছে কী যে নাই কে বা জানে,
কী জানি রচিলে আমার পরানে
      কত-না যুগের কাহিনী—
কত জনমের কত বিস্মৃতি
      ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী!

কাহিনী

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।
শানিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা—
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মতো বসি আছে,
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি,
বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দু-নয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মুলতানি সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসবরাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জ্বলেছে শত শত বাতি—
বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।

প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা নাড়া—
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক-তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ,
বরজলাল-পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, 'ওস্তাদ জী,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে! ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিল, একালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।'

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ, শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপ রায় দিতেছে শত উৎসাহ—
'আহাহা, বাহা বাহা!' কহিছে কানে, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহ।'

সভার লোকে সবে অন্যমনা— কেহ বা কানাকানি করে,
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চলে যায় ঘরে।
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান' ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, 'গরম আজি অতিশয়।'
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ ওঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দু দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া—
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে, লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায় পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান— আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি—
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি!
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে—
'আইস হেথা হতে আমরা যাই' কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ!
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ!
জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা মিনতি তব পদে স্বামী!
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।'

২৪ আষাঢ় ১৩০০

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর,
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, ‘কেষ্টা বেটাই চোর।’
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি ‘কেষ্টা’—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক’রে আনে।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে ‘পাজি হতভাগা গাধা’
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, ‘আর পারি নাকো!
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল! শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!’
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, ‘পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে!’
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি—
প্রসন্নমুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি-অকাতর-চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।

পরিবার তায় সাথে যেতে চায় ! বুঝায়ে বলিনু তারে
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে ।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে ।'
আমি কহিলাম 'আরে রাম রাম ! নিবারণ সাথে যাবে ।'

রেলগাড়ি ধায় ; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে ।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য !
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য ।
নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত ।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে ।
কোথা ব্রজবালা ! কোথা বনমালা ! কোথা বনমালী হরি !
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত ! আমি বসন্তে মরি ।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, 'কেষ্ট, আয় রে কাছে ।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে !'
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য ।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত ।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন ।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে—
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে ।

হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন   বন্ধ হইল নাড়ী।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,   এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে   ফিরিনু সারিয়া তীর্থ—
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই   মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই   আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী,   ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর   মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে,   করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে   সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে   বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে   গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ   সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে   এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল   রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে,   'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে   বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রী, সকলি বিক্রি   মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায়   আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত   কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান   রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল   দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে   হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম,   কত মনোরম দৃশ্য!

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল— নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা, সুখহীন—
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !'
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ—
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন !'
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয় !'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।'
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে !

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী ; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো— 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্মপরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো ; সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক্।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপিচুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি!' পাগলের প্রায়

অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে? জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই; যাতায়াতে মাস দুই কাল,
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।

হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?'
সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তর-মুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর? চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি

লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধতবিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ—
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা; করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি ওঠে তরাসে নিষ্ঠুর

যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভৎর্সিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ করে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে— ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর?
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা?
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা?'
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি! মাসি! মাসি!'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্ রাখ্ রাখ্!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গমাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক

অনন্ততিমিরতলে ; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে,
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে ;
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে প্রভু, হীন উপহার

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয়-দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে রিক্ত হাতে শ্রান্ত নত শিরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

দীন দান

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দর-দর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন ; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।'

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি, যেথা তরুচ্ছায়ে

সাধু বসি তৃণাসনে ; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
'হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে ?'

'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
'দেব নাই ! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা ?'

'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'

ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান !"

শান্ত মুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন,
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্তে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেই ক্ষণে

পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ।'

রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।'

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।'

১৩০৭

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু-বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল— পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়ে ফিরে,
ব্রত ধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন, ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;

শুনে রামায়ণ-কথা ; সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনীচে
সবার প্রসন্নদৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি। সূর্য চন্দ্র হতে
পশুপক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা— সকলের কাছে
আকুল-বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে।

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর
যকৃতের ঘটিল বিকার ; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধালো নারী, 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর ?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই ?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে ?
এত ক্ষুধা দেবতার ? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু, তবু ক্ষুধা মিটিল না ?'
ব্রাহ্মণ কহিল, 'বাছা, এ যে ঘোর কলি !
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি,
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো ?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো ?
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে

পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজ হস্তে সন্তানে কাটিল ; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমিষে।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে,
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে ?
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা গঙ্গার কাছে ; শেষে পুত্রজন্ম-পরে
অভাগী বিধবা হল, গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা গঙ্গারে ডেকে,
মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী
শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল। নিষ্ঠা এরে বলে।'
মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে,
আপনারে ধিক্কারিল— এতদিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা,
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে। অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
পড়ে যায়, কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর।

দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ, শয়নশিয়রে
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,
'ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ!'
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল, ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি—
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিল নারী।
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি,
কহিল, 'মায়ের ডাক ওই শুনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়,
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা!'

জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা গেল শূন্যঘাট-পানে।
কহিল, 'মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা, জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
এক-মনে।' এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না;

ধ্যানে নিরখিল বসি মকরবাহনা
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে ক'রে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল ; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবী-কোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, 'রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্
তোর ধন তোরে দিনু।' রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, 'কই মা !··· কোথায় !'
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী ;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, 'দিবি নে ফিরায়ে ?'
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

২৪ আশ্বিন ১৩০৬

কল্পনা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সুহৃৎকরকমলে

বৈশাখ
১৩০৭

কল্পনা

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।

সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জোড়াসাঁকো
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
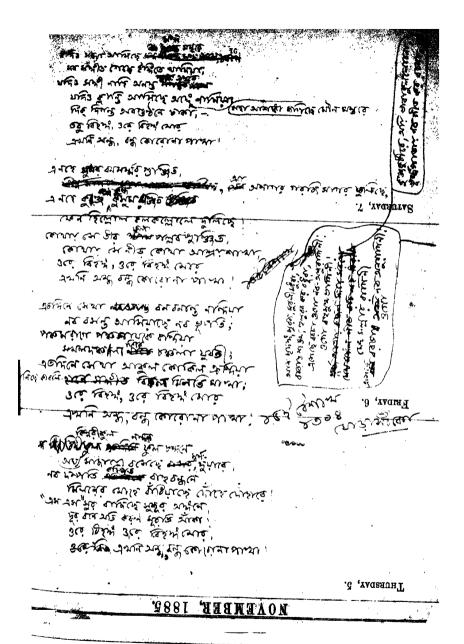
'কল্পনা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ;
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা !
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী !
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী !

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে,
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী—
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী—
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না—
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে—
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা—
শত-শত-গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

জোড়াসাঁকো
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

চৌরপঞ্চাশিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনকচাঁপার ডোর !
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশয্যায়—
ওগো সুন্দর চোর,
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর।

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর !
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানলশিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগলতিকা—
ওগো সুন্দর চোর,
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মূঢ় আবেগে ভোর।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা, বধির তাহারা,
অন্ধ তাহারা ঘোর।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়—
ওগো সুন্দর চোর,
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজবালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুক সারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ জোড়।

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে—
ওগো সুন্দর চোর,
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

২৩ বৈশাখ ১৩০৪
পরিবর্ধন : কলিকাতা, ৪ জ্যৈষ্ঠ

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, উর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা

দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে— মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত— মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে!
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো, মুখখানি তার
নতবৃন্তপদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বোলপুর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হত সুরার মতো সুরভি—
পরান হত অরুণবরনী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুলমুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী—
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুল নয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে,
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া—
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুযামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে—
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল-দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদুচরণে বাসরগৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।

এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে—
নবীন করো মানবঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহা পুলকে!
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা!
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্‌ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্‌ পিপাসা!

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!

পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে!
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
ভীরু পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো তাই ব'লে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না।
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা,
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পারো ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না বন্ধু, চেয়ো না।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না!
যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ, গরবীরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

বোলপুর
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

চৈত্ররজনী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্রনিশীথশশী!
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কী দেখিছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী!

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে!
শাখাপ্রশাখার, দ্বার-জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী।

মোরে দেখো চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবন-ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্রনিশীথশশী!

জোড়াসাঁকো
১৯ বৈশাখ ১৩০৪

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু হাত, কহিনু, 'আহা কী কর!'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি,
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে
তবু সে গেল না সরে।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু,
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু!'
সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরালো না।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল !'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে—
কেন সে এল না ফিরে !

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

পিয়াসী

আমি তো চাহি নি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির-লোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে—
তুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে
বসিয়া অশথছায়ে
নবীননবনীনিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ,
আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি তো কহি নি কথা।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানালো ব্যাকুলতা।

আম্রকাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে—
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মউমাছি উড়ে আসে।
সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ,
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি তো যাই নি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
আকাশ উঠিছে জাগি,
ধরণী চাহিছে উর্ধ্বগগনে
দেবতা-আশিস মাগি।
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উড়িছে গোখুরধূলি—
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।
তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ,
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরান নীরবে ক্ষুব্ধ।

১৩০৪

পসারিনী

ওগো পসারিনী, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়!
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়!
সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনী, কথা রাখো— দূর পথে যেয়ো নাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল—
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকনকোমল।
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি— ওগো শ্রান্ত পসারিনী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক—
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লিরবে কী মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালসঘোর—

যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর।

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে—
নাই গেলে বহু দূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে!
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে।
শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত
যদি মনে বড়ো ভয় লাগে।
শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি—
দুগ্ধদোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি।

ওগো পসারিনী,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি—
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি।

বোট। শিলাইদহ
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।

এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়, সে কোথায় !'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি !'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বালে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ—
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন-মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়, সে কোথায় !'
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি !'

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ,
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি,

রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!'

বোলপুর
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

প্রণয়প্রশ্ন

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্চার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য?
আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজ-সম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি?
চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি?
এ কি সত্য?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য?
তপ্ত কপোল-পরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণবাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে,
এ কি সত্য ?
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

রেলপথে
১০ আশ্বিন ১৩০৪

আশা

এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে ; শিয়রে আমার

জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল— তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;
সহসা জাগিয়া দেখি, এ শুধু স্বপন !

১৩০৫

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয় বীজন করি। রয়েছ মা, ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,

তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।
নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ, যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিক-ময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—

ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার—
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনী।
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধশীতল ধরণী।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়—
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুমভূষণজড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

মাতার আহ্বান

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী !
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে,
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী ।
ডাকো 'চলে আয়, তোরা কোলে আয়',
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায় —
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি ।

আমরা প্রভাতে নদী পার হনু,
ফিরিনু কিসের দুরাশে ।
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
ঢালিনু জঠরহুতাশে ।
খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে !
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে !

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে—
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষবসনে ।
তুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে,
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে—

চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে
না ভুলি আলেয়া-ছলনে।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননী,
এ পরপুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূর-কুঞ্জ-তিমিরে।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছুসি উঠে অধীরে।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে।

নাগর নদী। আত্রাই পথে
৭ আষাঢ় ১৩০৫

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।
তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি?

পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি !
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন— যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে মাতঃ,
কী দিবে সম্মান !

১৩০৪

হতভাগ্যের গান

বিভাস। একতালা

বন্ধু,
কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস !
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

আমরা সুখের স্ফীত বুকের
ছায়ার তলে নাহি চরি।

আমরা দুখের বক্র মুখের
চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী
তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি,
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইকো তাহে প্রতারণা,
টান যখন মরণ-ফাঁসি
বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা,
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়-শিখা
দিক্ মা, এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি
সমান-ভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম
চুকিয়ে দিলেম স্তুতি নিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধুলো,
তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস!'

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে ‘জাগো,
প্রভাত হল তোমার রাতি’
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,
বিদায়-কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস।

বড়ল নদী। ৭ আশ্বিন ১৩০৪
পরিবর্ধন : নাগর নদী। পতিসর
৭ আষাঢ় ১৩০৫

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, ‘শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র ?
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি !
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।’

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য?'

কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য।
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
জগত হল ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা—
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত।

কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধুলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিত-মতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশ-সুদ্ধ!'

মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ ?'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে—
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে ?'
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪

সে আমার জননী রে

ভৈরবী। রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ'পরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে !

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

[১৩০৪]

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল-মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্দ্রে ছায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার।

আজি মাতা পাঠাইছে— অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

১৩০৪

ভিখারি

ভৈরবী। একতালা

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কী কাতর গান গাই'?
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারি, আমার ভিখারি!
হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস,
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারি, আমার ভিখারি!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

পতিসর
১২ আশ্বিন [১৩০৪]

যাচনা

কীর্তনের সুর

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো— তোমার
চরণমঞ্জীরে।

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখিটি— তোমার
কনককঙ্কণে।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো— তোমার
ললাটচন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে।

সাহাজাদপুর। বোট
৮ আশ্বিন ১৩০৪

বিদায়

বিভাস

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরবভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার—

মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ইছামতী
৭ আশ্বিন ১৩০৪

লীলা

সিন্ধুভৈরবী

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত
ছলভরে!
ওগো, ঘরে ফিরে চলো, কনককলসে
জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা,
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত ছলভরে!

হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত ছলভরে।

হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে
মেঘমেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ'পরে
কত ছলভরে।

[ভাদ্র-আশ্বিন] ১৩০৪

নব বিরহ

মল্লার

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে—
অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়খনে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ঝরো ঝরো ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়কোণে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে!

ইছামতী
৬ আশ্বিন ১৩০৪

লজ্জিতা

ভৈরবী

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে !
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে !
আলোকপরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে !
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে !

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী',
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে !
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে

যমুনা
৭ আশ্বিন ১৩০৪

কাল্পনিক

বেহাগ

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে!
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

বলেশ্বরী
৮ আশ্বিন ১৩০৪

মানসপ্রতিমা

ইমনকল্যাণ

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,

কল্পনা

মম শূন্য-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী!

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী!

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে
অয়ি মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী!
মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী!

চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি
৯ আশ্বিন ১৩০৪

সংকোচ

ছায়ানট

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।

যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

চলন বিল। ঝড়। বোট টলমল
৯ আশ্বিন ১৩০৪

প্রার্থী

কালাংড়া

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নবপ্রভাতের নবীনশিশির-ঢালা।
শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

নাগর নদী
১০ আশ্বিন ১৩০৪

সকরুণা

আলেয়া

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে!
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে!
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

নাগর নদী। মেঘবৃষ্টি। অমাবস্যা
১০ আশ্বিন ১৩০৪

বিবাহমঙ্গল

ঝিঁঝিট

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ !
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত
জাগাক জীবনে নববসন্ত,
যুগল প্রাণের নবীন মিলনে
করো হে করুণনয়নপাত।
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমারি প্রসাদ-অরুণ
করুক উদয় নবপ্রভাত।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য
নবনবরূপে দিবস-রাত।

১৩০৪

ভারতলক্ষ্মী

ভৈরবী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনকজননী-জননী !
নীলসিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।

পৌষ ১৩০৩

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা—
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা,
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি!
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার আছে!

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি!
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা,
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া।

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারো সে যে কোনো কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু।
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত এজন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে!
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্বগগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি,
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে,
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি—
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী,
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে—
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে।

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল 'নরনারী, শুন সবে,
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে!
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি।

উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এত কাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে !
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে !'

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি।
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে— সকলি পড়েছে ধরা !
শুনে 'ছিছি' ব'লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা !
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়, যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত !

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
'হয়েছে প্রমাণ' 'হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে—
'যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।'
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
'আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।'
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি !'

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে,
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি, হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা !

১৩০৪

উন্নতিলক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ?
সিংহদুয়ারে পথের দু ধারে
রথের না দেখি অন্ত—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত ?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ।
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচালো হীনতাপঙ্ক ?
ভারতের শুচি যশশশীরুচি
কে করিল অকলঙ্ক ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য ?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি॥

অভাগা কে ওই মাগে নাম সই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণচিহ্ন ?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত !
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে ?
কী অপরাধের কর্ম ?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমরপুষ্পগুচ্ছে ॥

২

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ—
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য ?
কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস ?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য ?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী ?

শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মন্ত্রনিষিদ্ধ পক্ষী।
দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজাভবনের পূজ্য—
যাঁহাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে.
দেবী হয়ে গেছে উহ্য?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সন্থ
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম॥

—

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে
অবমানে আঁখি রক্ত?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা-জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য?

উত্তর

না না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে॥

৩

লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি,
বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরনে ধারনে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ !
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি,
যদি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঁষি
কিছু যেন কড়ামূর্তি !
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা !
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ ?
এঁরা কি ভারতদ্বেষ্টা ?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা ?

উত্তর

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি ব'লে গণ্য—
কোট-পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য ॥

—

অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী, এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য ।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস—

তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া ?
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এক বর্ণ ?

উত্তর

না, না, এঁরা হন জনসাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র ॥

৪

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
ঘোরতর জরাজীর্ণ।
উচ্চ আসনে বসি একমনে
শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মন্ত্রশ্লোক
করিছে বচনবৃষ্টি।
জলের সমান করিছে প্রমাণ
কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব সনের
পূর্বে যা নহে সৃষ্ট।

শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
নিখিল পুরাণতন্ত্রে ?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে ?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট ?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
আয়ু করিছেন নষ্ট ?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
বচনরচনে সিদ্ধ—
কহ তো ম'শায়, প্রাচীন ভাষায়
কতদূর কৃতবিদ্য ?

উত্তর

ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু সর্গ রঘুবংশ—
মোক্ষমূলার হ'তে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ ॥

—

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিতশির,
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি—
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক্
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত!
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড!

উত্তর

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি—
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি॥

১৩০৬

অশেষ

আবার আহ্বান?
যত-কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন।

মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে—
আবার আহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়নপল্লব'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান।
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি-সম—
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে— শেষ নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ—
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান—
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা—
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি
কুটিরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ ?
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ ?

যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান—
মনে রেখো হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে—
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।

কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়—
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি'পরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণপরিণাম—

হাসি নয়, অশ্রু নয়,
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন।
প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি
মুদুক নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরম নির্বাক্‌।

হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

১০ চৈত্র ১৩০৫

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান—
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি।
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার— আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ডমূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন তাপ পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।

কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘনী অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি!
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ-সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয়!

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান'।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গনিব না দিন ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,

লাভ-ক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব—
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তর-পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্ত-ধানের খেতে বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে ?
আজি এই দুরন্ত দুর্দিনে !

দেখিছ না ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা !
মনে ভেবে দেখো তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালিমালিকা।
ভেবে দেখো ওগো সাহসিকা !

আজিকার এমন ঝঞ্চায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্চায় ?

হে উতলা, শোনো কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্যোগে, শোনো ওগো শোনো !

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্যমাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু—
মেঘ ডেকে ওঠে গুরু গুরু ?

যাবে যদি, মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হ'ত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম—
মিশে যেতে আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি-কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ংকর।

তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলি হানিত আঁখি'পর—
যাত্রা হত মত্ত ভয়ংকর।

কেন আজি যাও একাকিনী?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী?
এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?
কোথা আজি যাও একাকিনী?

১৩০৬

অসময়

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে?
এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি?
দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে—
ফুরালো কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে?
ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে?
ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।
মরীচিকালেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে
সারা দিন আজি ছলনা করেছে হতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

এত দিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী।
বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্নাযামিনী।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহুবন্ধনে,
ধ্বনিছে শূন্যে জয়সংগীতরাগিণী।
নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে
দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়বিলাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,
শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া।
বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।
আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
জীবন-আহুতি দিলাম কী আশাহুতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজনমাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সংগীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।

এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে!
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অন্ত রে,
শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির-প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

১৩০৬

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
মর্তে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দারমঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণা বেণু—
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণমদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ— তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা?

সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি।
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা বাঁশরি।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়
ওগো মধুমাস
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা-চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি!
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর !

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণরেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী !

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার।
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে—
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

১৩০৬

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।

তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী,
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তিসিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণতলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।
তোমার নির্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর।
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলীদল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখা-বৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

জগতের সেই-সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে,
গনিতেছে গোপন সম্পদ—
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি—
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১৩০৬

অনবচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ;
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত-আকাশ-তলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়েছিনু চলি মৃত্যুপরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

১৩০৬

জন্মদিনের গান

বেহাগ। চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে।

আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে।

পূর্ণকাম

কীর্তনের সুর

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ।
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে!

সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে !
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।

পরিণাম

ভৈরবী। ঝাঁপতাল

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে।
জানি হে, তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে—
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন-রজনী
সকল পথে-বিপথে সুখে-অসুখে।
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয়পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে।

১৩০৬

ক্ষণিকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
        ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
        ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেন-পক্ষে
        ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
        সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
        স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কি অগ্নিকণায়
        ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
        আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
        বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রবীন্দ্রনাথ

১২৯৭

ক্ষণিকা

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে—
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে!
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর ’পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে।

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজন-দরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেরই পালা,
ঋণী জনের না যায় পাওয়া দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল।

কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাত-কালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎ-মেঘে ত্বরিত বরিষনে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল, লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল-বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল।

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় করে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন—
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
বসে বসে কেবল জমা করি,
ফেলাছড়া-ভাঙাছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি,
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া।
বুঝেছি ভাই, সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,

দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
    এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।
সংসারেতে সংসারী তো ঢের,
    কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড়ো লোক—
    সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো।
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে,
    লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া—
        বুঝেছি ভাই, কাজের মধ্যে কাজ
            মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
    যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে ঝুড়ে
    ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব-আলোচনা।
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে ফেলে
    নয়নবারি শূন্য করি দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
    অট্টহাসি শোধন করি নিব।
ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
    উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া,
        শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
            মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
    বন্ধ করো শ্রীমদ্‌ভাগবত।

শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-না তবে।
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর।
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌ব নাকো রাজার দারোগারে—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, 'রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,
গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি।
একটুখানি সরে গিয়ে করো
সঙের মতো সঙিন ঝম-ঝমর।
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।'

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,
'ভাগ্য নামে অতিবর্ষা-সম!
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি,
জান তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।

ফাগুন-মাসে ঘরের টানাটানি—
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর।
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী—
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।'

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানা কথা।
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা।

সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়—
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সংপ্রসঙ্গ-আলোচনায়।
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়-পত্র,
চালান মামলা-মকদ্দমা,
ফাগুন-মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন
থাকুক রত কঠিন ব্রতে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী!
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে—

নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ-ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু—

তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়োই বর্বরতা—
সময় যে নেই, সময় যে নেই

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি,
এসো আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
তুমি এসো, এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্তভূমি—

যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

ইচ্ছে করে ব'সে ব'সে
পদ্যে লিখি গৃহকোণায়
'তুমিই আছ জগৎ জুড়ে'—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনো মতেই
সান্ত্বনা আর মান্‌ব না রে
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই,
কখন তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দু ধারে সব উদারচিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।

আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে সত্ব নত্ব।

চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্যপুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
তোমারি নাম বেড়ায় রটি—
থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে !
চাই নে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।
চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

ত্রিভুবনে সবার বাড়া
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে-সব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই—

কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চ সুরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি,
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যদি বল 'আর বছরে
এই কথাটাই এমনি ক'রে
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে'—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে
কাল সকালে যাবে ভুলে—
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী, তেমনি কবে
এ-সব কথা ভুলব যবে
মনে রেখো আমায় তবে—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,

চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র
'পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা
তৈলাধার কি পাত্র',
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্তনাশন,
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস কি আসন ?
গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান ?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিতমধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা,
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পুরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী,
সেথায় করবি যাত্রা ?
গান তা শুনি কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
এক্‌জামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায়,
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সামনে আছে খোলা,
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা—
সেইখানেতে ছেঁড়াছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
করবি কি তুই খেলা ?
গান তা শুনে মৌনমুখে
রহে দ্বিধার ভরে—
যাব-যাব করে

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে,
বালিশ-তলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে—

কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা
চুলের-গন্ধে-ভরা,
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস কি যেতে ত্বরা ?
বুকের পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?
যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান।

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,

মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর

তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই, বোঝাপড়া,
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।
মনেরে তাই কহ যে.
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অচেনা

কেউ যে কারে চিনি নাকো
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে,
মনের মধ্যে চিন্তা—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন তা।
বাইরে যা পাই সমঝে নেব
তারি আইন-কানুন,
অন্তরেতে যা আছে তা
অন্তর্যামীই জানুন।

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি,
সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখে সরল দৃষ্টি—
করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে
জড়ায় বাহুবন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রইব হয়ে অন্ধ—

কে যাবে ভাই, মনের মধ্যে
মনের কথা ধরতে ?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্তে ?

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস ?
আছে কারো আপন হাতে
মন ব'লে এক জিনিস ?
চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে—
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে !

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাস
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই—
এমন কথার দেব নাকো আভাসও,
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই।
নাইকো আমার কোনো গরব-গরিমা—
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সংগত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্তত।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চার জনা।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের 'পরেই আমার অভিরুচি।

কবির বয়স

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক

বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক ?
কবি কহে, 'সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ !
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে—

কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো মন্দই গনি।

'সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদ-বর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে,
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়-হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে—

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?

'কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে,
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে
জগৎ-মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ—

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।'

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।

মাথার দিব্য, উঠো না কেউ
আগ বাড়িয়ে দিতে আমায়—
চলছে যেমন চলুক তেমন,
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।

একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থামতে যে চাই—
আজকে কিছু শ্রান্ত আছি,
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।

আঁধার-আলোয় সাদায়-কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝগড়াঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধটু এটা-ওটা
বদল যদি পারত হতে
থাকত নাকো কোনো খোঁটা।
বদল হলে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বসত।

তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালোই গেছে, কিছু না চাই—
আজকে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল্ খসে খসে—
কী জানি কার দোষে!
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখছ বসে বসে।
চোখ-দুটিরে প্রিয়ে,
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হল
কাহার দৃষ্টিদোষে!

আজ যে বসে গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি
বলুক আঁখি-দুটি—
কেন আমার রুদ্ধ কণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে!

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে—
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে

এমন কোনো কর্ম দেহো
অকর্মণ্য দাসে।

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে?
দাও তো ভালোই, কিন্তু জেনো
হে নির্মলে,
আমার মালা দিয়েছি ভাই
সবার গলে।
যে-ক'টা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম
উদ্দেশেতে সবায় দিনু—
নমো নমঃ।

কেউ বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানে না,
কারো বা মুখ ঘোমটা-আড়ে
আধেক চেনা।
কেউ বা ছিলেন অতীত কালে
অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু
কবির গীতে।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে

কহেন বিধি 'তুভ্যমহং
সম্প্রদদে'।

হৃদয় নিয়ে আজ কি প্রিয়ে
হৃদয় দেবে?
হায় ললনা, সে প্রার্থনা
ব্যর্থ এবে।
কোথায় গেছে সেদিন আজি
যেদিন মম
তরুণ-কালে জীবন ছিল
মুকুল-সম,
সকল শোভা সকল মধু
গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বদ্ধ ছিল
বন্দী-মতো।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে—
অনেক দেশে, অনেক বেশে,
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে
একটিখানে
এমনতরো মোহন-মন্ত্র
কেই বা জানে!
নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা করে ওড়াই সখী,
নিজের কথাটাই।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
উল্টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কিনা
বুঝব কেমন করে?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই,
না আসি তোর কাছে।
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর

প্রকাশ হয় রে পাছে
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই,
স্পর্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

পরামর্শ

সূর্য গেল অস্তপারে—
লাগল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রানীর দেশে
নূতন সাজে সেজে?
এবার যদি বাতাস উঠে
তুফান জাগে শেষে,
ফিরে আসবি নে যে।

অনেক বার তো হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী।
সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন-রশারশি।

এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত ?
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী,
রাখ্ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ওই যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি,
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এ পার হতে পারে
যাস রে খেয়া বেয়ে।
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলেমেয়ে।
ও পারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী—

সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এ-ঘাট ও-ঘাট
ইচ্ছা করিস যদি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বে নাকো আর,
হায় রে মরণ-লুভী!
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি!

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা

ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!

সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী!
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।

তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী।

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
　　দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
　　কণায় কণায়।

আমি নাবব মহাকাব্য-
　　সংরচনে
　　ছিল মনে।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
　　হৈল গত
　　স্বপ্ন-মতো!
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
　　অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
　　নয়ন-খড়্গ।
রইল মাত্র দিবারাত্র
　　প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
　　কীর্তিকলাপ।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
　　হৈল গত
　　স্বপ্ন-মতো!

সেসব-ক্ষতি-পূরণ প্রতি
　　দৃষ্টি রাখি!
　　হরিণ-আঁখি!

লোকের মনে সিংহাসনে
নাই কো দাবি—
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে,
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।

জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।
ছটা ঋতু পূর্ণ করে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি
দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা।

৩

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত!
আসত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক-শাখা উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে!
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

৫

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত ব'সে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে
নূপুর-দুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।

৬

প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইত শৌরসেনী,

বলত সখীর গলা ধরে—
'হলা পিয় সহি'।
জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে,
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম
দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।
আশা করি নামটা হ'ত
ওরই মধ্যে ভদ্রমতো—
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্‌ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি
ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্‌
মালবিকার জালে।

কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্লনিশায়
যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে !
ছল করে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে !

৯

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল !
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ-সাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।
কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল !
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল !

১০

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন
সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায়
করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা,
ফাগুন-মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সে-সব বরাঙ্গনা।

১১

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য-দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য

যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না ভাই, নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্তলোকে।

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমায় তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে।

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস; হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।

আমি   করেছি কঠিন পণ
যদি   না মিলে বকুলবন,
যদি   মনের মতন মন
          না পাই জিনি,
তবে   হব না তাপস, হব না, যদি না
          পাই সে তপস্বিনী।

আমি   ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
          উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি   ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
          ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি   না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর   বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি   না বাজে কাঁকন মল
          রিনিক-ঝিনি—
আমি   হব না তাপস, হব না, যদি না
          পাই গো তপস্বিনী।

আমি   হব না তাপস, তোমার শপথ,
          যদি সে তপের বলে
কোনো   নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
          নূতন হৃদয়-তলে।
যদি   জাগায়ে বীণার তার
কারো   টুটিয়া মরম-দ্বার,
কোনো   নূতন আঁখির ঠার
          না লই চিনি
আমি   হব না তাপস, হব না, হব না,
          না পেলে তপস্বিনী।

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে,
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে।

জলের ধারে কুটিরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের 'পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ওই-যে শুনি মাঝে মাঝে
না জানি কোন্ নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে।

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।

এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।

আরেক দিন সে ফাগুন-মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে খেতের 'পরে
ধূসর আলো ধু ধু করে,
বসে আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চলছি ফিরে
অকারণে।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
  সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
  নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
  ব্রজের রাখাল বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
  সুসভ্যতার আলোক।

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
  বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
  পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
  শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
  বংশীবটের তলে।

'ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই'
  ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
  উঠল ঘরে ঘরে।

হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
'ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই'
ডাকে পরস্পরে।

ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া-তরীর পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে।

মোরা নব-নবীন ফাগুন-রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোক-বনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি
যবে দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠবে আকাশ ঘিরে
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে।

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

কর্মফল

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি—
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন—
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা -সমালোচন।

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এমনি কটু বলব তাকে

যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
　　দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন—
　　　　আমায় হয়তো করতে হবে
　　　　　আমার লেখা -সমালোচন।

বলব, 'এ-সব কী পুরাতন!
　　আগাগোড়া ঠেকছে চুরি।
মনে হচ্ছে, আমিও এমন
　　লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।'
আরো যে-সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজছে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
　　এ জন্মে হয় অনুশোচন—
　　　　আমায় হয়তো করতে হবে
　　　　　আমার লেখা -সমালোচন।

তোমরা যাদের বাক্য হয় না
　　আমার পক্ষে মুখরোচক
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
　　হও পুনর্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম ক'ষে ব'সে ব'সে
　　প্রতিবাদের প্রতি বচন।
　　　　আমায় হয়তো করতে হবে
　　　　　আমার লেখা -সমালোচন।

লিখব, ইনি কবিসভায়
হংসমধ্যে বকো যথা!
তুমি লিখবে, কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা!
আমি তোমায় বলব— মূঢ়!
তুমি আমায় বলবে— রূঢ়!
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচি-রোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব,
আমি কড়া সমালোচন

৫ আষাঢ়

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।

মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানে না সেই খবর কেহ।

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার ক'রে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
ভদ্র পোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্ল মুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্যমনে,
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয় 'লোকটা রসিক',
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি ?
শত্রুরা কয় 'লোকটা হাল্কা',
কিছু কি তার নাইকো ভিত্তি ?

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

সুখে আছি লিখতে গেলে
লোকে বলে, 'প্রাণটা ক্ষুদ্র!
আশাটা এর নয়কো বিরাট,
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।'
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর—
বলে, 'একটু হেসে-খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর।'
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে তবু
ফেলো পাঠক, চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধবুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

৬ আষাঢ়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব—
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি,
কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালুমরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই!

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই!
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ-মনে
রইব না আর কভু।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু
আর কারে তো পাবই।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী—
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

বিদায়-রীতি

হায় গো রানী, বিদায়-বাণী
এমনি করে শোনে ?
ছি ছি, ওই-যে হাসিখানি
কাঁপছে আঁখিকোণে !
এতই বারে বারে কি রে
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার—
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করেই বলি—
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে আসব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়—
এরাও তো নয় যাবার।
সহস্র বার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়ো নাকো।

ভ্রমক্রমে ক্ষণেক-তরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে
আকুল স্বরে যখন কব
'সময় হল যাবার'।
তখন নাহয় হেস্নো, যখন
ফিরে আসব আবার।

নষ্ট স্বপ্ন

কালকে রাতে মেঘের গরজনে
রিমিঝিমি-বাদল-বরিষনে
ভাবতেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি,
বৃথা স্বপ্নে কাটল সারা রাতি।
হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি—
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে,
আমি চলি আমার শূন্য পথে।

কালকে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
মিথ্যা যদি মধুর রূপে
আসত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হ'ত ক্ষতি—
স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি ?

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল।
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল।

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হু হু
ধু ধু বালুর ডাঙা—

থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো,
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে,
নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বৈ নয়কো মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে—
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি

বসন্তী-রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া একটু রাখা,
একটু প্রকাশ একটু ঢাকা,
একটু হাসি একটু শরম—
দুজনের এই বোঝাবুঝি।

তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

মধুমাসের মিলন-মাঝে
মহান কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মতো নাইকো কিছু.
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজি নে ভাই ভাষাতীত,
আকাশ-পানে বাহু তুলে
চাহি নে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই যেটুকু পাই
তাহার বেশি আর কিছু নাই—
সুখের বক্ষ চেপে ধরে
করি নে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইকো তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা—

বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে
দিয়ো, দিয়ো মন—
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ারখানা,
ভোলা আমার প্রাণ—
কখন যে কার আনাগোনা
নইকো সাবধান।
পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে—
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামি—
এমনি ক'রে একে একে
সর্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে দিয়ো, দিয়ো মন—
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ

আমায় যদি মনটি দেবে
নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরো না কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ করে
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি তো
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে
রাগ কোরো না চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।
কোনো দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোনো দিন বা শূন্য থাকে—
মিথ্যা সে দোষ ধরা।

আমায় যদি মনটি দেবে নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরো না কেউ দায়ী

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে,
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে

মিথ্যা কোনো জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো,
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।

আমায় যদি মনটি দেবে, রাখিয়া যাও তবে—
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকতে হবে।

স্বপ্নশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই—
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান—
তাই নিয়ে কি রচি দিব
একটি ছোটো গান?

একটি ছোটো মালা তোমার
হাতের হবে বালা।
একটি ছোটো ফুল তোমার
কানের হবে দুল।
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোটো খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,

ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়!
বর্ষানদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়!
অকূল-মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়?

আমার তরীখান
সইবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে।
একটি কুমুদ তুলে তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।
ভেসে ভেসে শুনবে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।

ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—
সত্য করি কই,
হায় গো পথিক, হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে
পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইকো স্নানের ঘাট,
ধূধূ করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকালবেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের 'পরে,
নৌকা চলে দু-একখানি
অলস বায়ু-ভরে।
অঘাটাতে বসে রইলে,
বেলা যাচ্ছে বয়ে—
দাও গো মোরে কয়ে
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই?

সে কহিল, ভাই,
না ই, না ই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূর গ্রামের দু-একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারা দিবস ধরি।
জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর-শাখা হতে

ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের 'পরে অশথতলে
যাচ্ছে বেলা বয়ে—
দাও আমারে কয়ে
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
না ই, না ই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

যাত্রী

আছে, আছে স্থান !
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
নাহয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,
নাহয় কিছু ভারী হবে
আমার তরীখান—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি ?
আছে, আছে স্থান !

এসো, এসো নায়ে !
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক্‌-না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল জলদ-বরণ
বসনখানি গায়ে।

তোমার তরে হবে গো ঠাঁই—
এসো, এসো নায়ে।

যাত্রী আছে নানা,
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
বসবে আমার তরী-’পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা—
এলে যদি তুমিও এসো,
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বলতে যদি না চাও তবে
শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব ব’সে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান ?

এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ,
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।

তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক—
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন,
তাদের খেতে যখন তিসি ধরে
মোদের খেতে তখন ফোটে শণ।

তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুই তীরে

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি শুয়ে
বিজন বালু-ভুঁয়ে,
তুমি শোন কাঁখের কলস
ঘাটের 'পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

ঐ শোনো গো, অতিথ বুঝি আজ
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ
রাখো কাজ।

শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ!
পায়ে পায়ে বাজিয়ো নাকো মল,
ছুটো নাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।

ঐ শোনো গো, অতিথ এল আজ
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ
রাখো কাজ।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়
কভু নয়।

ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়
মিছে ভয় !

আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে দেখো ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময় ;
নাহয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয় ।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়
কভু নয় ।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়
মিছে ভয় !

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে
পান্থ-সনে ।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে
দুয়ার-কোণে ।

প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নিচু
নম্র দু-নয়নে ।
কাঁকন যেন ঝংকারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আনবে যবে সাথে
অতিথিসজ্জনে ।

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে
পান্থ-সনে ।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে
দুয়ার-কোণে ।

ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোনো কে অতিথ এল আজ
এল আজ।

সাজাও নি কি পূজারতির ডালা ?
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ ?
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে ?
হয় নি সন্ধ্যাসাজ ?

ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোনো কে অতিথ এল আজ
এল আজ।

সম্বরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউ-কথা-কও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে—
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সামনে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এমনিতরো বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপনারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাব না
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা।
আপনা ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস নে ভেঙে তোর বেদনা-বাঁধ—
মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।
গাব না গান আজকে দখিন বাতাসে।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

শিলাইদহ
২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

বিরহ

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর—
সূর্য তখন মাঝ-গগনে,
রৌদ্র খরতর।

ঘরের কর্ম সাঙ্গ করে
ছিলেম তখন একলা ঘরে
আপন-মনে বসে ছিলেম
বাতায়নের 'পর।
তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর।

চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা গন্ধ নিয়ে
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তিবিহীন,
একটি ভ্রমর ফিরতেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে
চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা বার্তা নিয়ে।

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউশাখাতে উঠতেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভ'রে
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে—
আবাঁধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর,
শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত-দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে—
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই-পহর।

শিলাইদহ
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ?
ওইটুকু যে চাওয়া
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ও পার থেকে
আমার এ পার-'পরে।
অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে।

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি,
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।
তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখলে কতখানি
একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি ?

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা,
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা !

তবে কিসের তরে
থামলে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে ?
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ?

দার্জিলিং
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে ?
সন্ধ্যা হল, ওই-যে বেলা
গেল রে বয়ে।

যে যার বোঝা মাথার 'পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে ঊর্ধ্বশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস
পসরা লয়ে ?

সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা—
হেরো ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে?

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউশের খেত জলে ভর-ভর,
কালী-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি ?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দর-দর বেগে জলে পড়ি জল
ছল-ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে—

আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝর-ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

২০ জ্যৈষ্ঠ

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে ?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?

দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা !
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কী গোপন মন্ত্রণা !

আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারো মনের কোনো কথা তারা
করেছে কি কল্পনা ?
দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা !

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি ?
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি ?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি ?
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি ?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে ?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায় ?
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?

শিলাইদহ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে   হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে!

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে   গরজে
গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে   নয়নে
লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী
এলায়ে ?
ওগো, নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে শ্যামল
বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে ?

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল
দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক—
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী— তরুণ
তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরান-হরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয়
নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

দুর্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে !
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধাবনে।

কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব-ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে !
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে !

হেরো গো আজিও প্রভাত-অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা,
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদল-ধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয় না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বার.বার—
ফুলের অভাব ঘটে নি তোমার,
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি !
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি।

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই।
তবু ক্ষণকাল রহ ত্বরাহীন,
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই।
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?

এত দিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে!
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন,
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে—
ওই-যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষনে।
এত দিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে!

১ আষাঢ়

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।

এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন'পরে—
নব কদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ
করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি—
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদী-কূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে
নবীন পাতা—
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদল-গাথা।

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।

দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

১ আষাঢ়

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
 ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
 কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
 কালো? তা সে যতই কালো হোক
 দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
 ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
 মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
 কালো? তা সে যতই কালো হোক
 দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
 জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
 আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
 কালো? তা সে যতই কালো হোক
 দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
 আর যা বলে বলুক অন্য লোক।

দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

৪ আষাঢ়

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে?
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে—
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে আছে,
জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদিঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!

আজ তো আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।
অতিথ হয়ে দিই নি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল-তরু-মূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ডদুয়ের তরে।

নতশিরে দুখানি হাত জুড়ি
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল।
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া—
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।
আষাঢ়-মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায়।
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।

কেমন করে জানব মনে আমি
কী যে আমায় ভাবলে মনে মনে!
কাহার লাগি একলা ছিলে বসে
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে!

তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে
হানতেছিল চমক তোমার চোখে,
জানত কে বা দেখতে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে!
কেমন করে জানব মনে আমি
আমায় কী যে ভাবলে মনে মনে!

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,
মাঠের 'পরে বৃষ্টি এল ধরে।
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি—
সন্ধ্যা হল— দুয়ার করো রোধ,
যাব আমি আপন পথ'পরে।
বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদিঘির ধারে।
কুটিরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো,
আমি কারো চাই নে কোনো দান
কাঙাল-বেশে কোনো ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি·
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা,
সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুসি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি
এক পয়সায় কিনেছে ও
তাল পাতার এক বাঁশি
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি সবার উপরে
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ!

আজকে দিনের দুঃখ যত,
নাইরে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি;
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি!
চেয়ে আছে
নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ!
৩০শে জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রা। শিলাইদহ।

"সুখদুঃখ" কবিতার পাণ্ডুলিপি

চেয়ে আছে নিমেষহারা,
নয়ন অরুণ !
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রা

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবস-রাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি নামল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল-পারা
পাতার ভেলা ডুবল নালার
তুফান লেগে
হঠাৎ বৃষ্টি নামল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে—
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাটল বেলা,
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।
ভাগ্য'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ!
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

কৃতার্থ

এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।

ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবই খোয়ালেম,
আছে আছে তবু আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি।

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা,
আমি তো চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন—
প্রহরী চাহিছ পশরার পণ?
ভয় নাই ওগো, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

কখন বাতাস মাতিয়া আবার
মাথায় আকাশ ভাঙে!
কখন সহসা নামিবে বাদল,
তুফান উঠিবে গাঙে!
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে—
পারানির কড়ি চাহ তুমি নেয়ে?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

ধান-খেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়ায়েছিলেম
নিরালা কুটিরদ্বারে।
থামিল বাদল, চলিনু এবার—
হে দোকানি, চাও মূল্য তোমার ?
ভয় নাই ভাই, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

পথের প্রান্তে বটের তলায়
বসে আছ এইখানে—
হায় গো ভিখারি, চাহিছ কাতরে
আমারো মুখের পানে !
ভাবিতেছ মনে বেচা-কেনা সেরে
কত লাভ করে চলিয়াছে কে রে !
আছে আছে বটে, আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
জোনাকি চমকে গাছে।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ,
নীরবে চলেছ পাছে ?
এ-ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া—

হবে না নিরাশ, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

নিশি দু-পহর পঁহুছিনু ঘর
দু হাত রিক্ত করি,
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখি-সম এলে মোর বুকে—
আছে আছে বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

২ আষাঢ়

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা!
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা!
বেলা যখন প'ড়ে এল,
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে—

তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা !

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা—
অনেক গন্ধ, অনেক মধু,
অনেক কোমলতা,
হে সংসার, হে লতা !
সে ফুল তোলার সময় তো আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা !

রেলগাড়ি। দার্জিলিং-পথে
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারো পিছুতে।
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরি-

উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি
নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারো পিছুতে—
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই—
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারো বকুনি-
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়ি নে।
যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই—
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু তাড়াতাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে—

অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরনে।
মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।
বুকভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।
মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী,
কুসুমকান্তি দেখি নাই মধু-পিয়াসী-

বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে।
কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে-
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।
সবলে কারেও ধরি নে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

যৌবনবিদায়

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই-না দাঁড়-বাওয়া—

তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া!
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান—
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান!
এ পার হতে ও পার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,
শ্রাবণ-দিনে ভরা গাঙে
দু-কূল-হারা পাড়ি!
অনেক খেলা অনেক মেলা
সকলি শেষ ক'রে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরই শেষ কটি গান দিনু বোঝাই করি।
সে-সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে—
রাখিস নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস নে আর,
চাহিস নে আর পাছে—
ফিরে ফিরে ঘুরিস নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।
এখন হতে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে
ভেসে যা রে স্বপ্ন-সমান
অস্তাচলের কূলে।

সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহুদিনের বোঝা তোমার
চিরনিদ্রার দেশে।

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠল হাওয়া, ছোট্ রে ত্বরা করি।
যেদিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়াবটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
'কে যাবি আয় পারে'।
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে,
এত লোকের ভিড়ে,
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে?
যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু-পারে।

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,

আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার—
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কে বা আছেন এবং কে নেই,
কেই বা বাকি কেই বা ফাঁকি,
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

নাই বা জানলি হায় রে মূর্খ!
কী হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!
সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো.
পারের নৌকা তৈরি হল—
যত পার ততই ভোলো
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুললে তোমার
শূন্য দেখি শেষের খাতা—
কী হবে ভাই, হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়কো লাভের খাতা।

আপনি আঁধার ডাকছে তোরে,
ঢাকছে তোমায় দয়া ক'রে।
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো!
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে প'ড়ে।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্ রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্ রে হয়ে বধির অন্ধ।

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ-মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা!

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী
ফলের দিন যাক সে ঝরি।
মরিস নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরই অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক রে সরি।
হোক রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হোক রে রিক্ত কল্পলতা!
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।

শেষ

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

অধিক দিন তো বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে—
যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে ?
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

সবই হেথায় একটা কোথাও
করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে
থাকে গানের রেশ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় ব'লে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রঙটি থাকে লেগে,
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ-সন্ধ্যা-মেঘে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি,
পাছে ঝ'রেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি,
পাছে যায় সে স'রে।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে,
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই,
বক্ষ-দোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

কোনো জিনিস চিনব যে রে,
প্রথম থেকে শেষ,
নেব যে সব বুঝে প'ড়ে—
নাই সে সময় লেশ।
জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু দিন
ভালোবাসবার মতো—
কাজের জন্যে জীবন হলে
দীর্ঘজীবন হ'ত।

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

আজ তোমাদের যেমন জানছি
তেমনি জানতে জানতে
ফুরায় যেন সকল জানা—
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই-যে নেশা লাগল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ-
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

বিলম্বিত

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ-ঘুমো আধ-জাগা,
তখন ছিল সর্ষে-খেতে
ফুলের আগুন লাগা,
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটির থেকে।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন-সুধা-ঢালা?

আজকে বহে পুবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে—
ধানের খেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো রে হায়
হাল্কা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্যে গানে
পাগল গণ্ডগোল।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজছে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরো ঝরো—
সজল বায়ে কদম্ববন
কাঁপছে থরোথরো।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়—
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।

ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট—
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি
পাখিরা গায়।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়।

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল—
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে
তাল-তলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।

আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা ;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপনপ্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

চিরায়মানা

যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।

এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক—
নূপুর যদি খুলে পড়ে
নাহয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না মালা হতে
মুক্তা খ'সে গেলে।
এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে।

হেরো গো, ওই আঁধার হল,
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ও পার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।

ওই রে গ্রামের গোষ্ঠ-মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে।
হেরো গো, ওই আঁধার হল
আকাশ ঢাকে মেঘে।

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বাল?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এমনি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বাল?

এসো হেসে সহজ বেশে,
আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব-গগন
বেলা নাই রে আজ—
এসো হেসে সহজ বেশে,
নাই বা হল সাজ।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘন-বিপুল-মন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে এক দিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক-আভরণ !

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাসপরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার।

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য-বিরচন—
একি রূপে দিলে দরশন !

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়।

১০ আষাঢ়

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকাননমাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন-দুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে

তোমার নাহি শীত বসন্ত,
জরা কি যৌবন—
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিবে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি

চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

নদীর মতো এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে—
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে

২৮ জ্যৈষ্ঠ

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়—
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলি নে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন আবার
গৃহকোণ-মাঝে আসিয়া
বাতায়নে বসি বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যে বা আসে যে বা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি—
জানে না তো কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।
মোর দীপে জেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি, হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে—
তাই তো সে শিখা ভবনশিখরে
পারি নে রাখিতে জ্বালায়ে।

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্মসাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা-পানে চাই স্বপনে।

৩ আষাঢ়

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।
নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক, লিখেছি অনেক লেখা—
পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।

কখন যে পথ আপনি ফুরালো, সন্ধ্যা হল যে কবে!
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের নূতন গানের রবে।
কখন যে পথ আপনি ফুরালো, সন্ধ্যা হল যে কবে!

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের চিহ্ন কি যায় দেখা!

নাটক ও প্রহসন

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক

বিনি পয়সার ভোজ

আপিসের বেশে অক্ষয়বাবু

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বাচওড়া কথা কন। মশায়, আজ বছর-খানেক ধরে রোজ বলে 'আজ খাওয়াব' 'কাল খাওয়াব', খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা হলে এতদিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত। যা হোক, আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু, দুটি ঘণ্টা বসে আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে, কী তোর নাম, ভুতো না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু তাই সই। তা, ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আসবে বলো দেখি।

কী বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমতো খানা। খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চক্‌চকে করে রেখে দেব। একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাকবে— কিন্তু, কতক্ষণই বা থাকবে! আর দু-রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হলে চেঁচেপুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে ক'রে ডজন-দুত্তিন অয়্‌স্টার প্যাটি আনে তা হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়্‌স্টার প্যাটি আসবে। ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বলো দেখি।

অনেক ক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক দাও-না। অনেক ক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু তোমার কোনো গা দেখছি নে।

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন? এমন তো কখনো শুনি নি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়! আমি একটু-আধটু আফিম খাই, তামাক না হলে আর তো বাঁচি নে। ওহে মোধো, না না, চন্দ্রকান্ত, কোনোমতে মালীদের কাছ থেকে হোক, যেখান থেকে হোক, এক ছিলিম জোগাড় করে দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু, তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এসো।

এক পয়সায় তামাক হবে না? কেন হবে না! বাপু, আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে? ষোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়— এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো-কলকেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে গেছেন নাকি? বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ ডিপজিট করে আসেন নি কেন? ওরে বাস রে! এ তো ভালো জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও, এই ছটি পয়সা ট্র্যামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নিতে হবে।— এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা হলে এঁর ভদ্রাসন-বাড়ি কিরকম হবে না জানি! কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল— আর তো পারি নে— এই মাটিতেই বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া
উপবেশন ও গুন্‌গুন্‌ স্বরে গান

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ!
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!

কই রে? তামাক এল? ও কী রে? শুধু কলকে? হুঁকো কই? এখানে

ছ পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না? কলকেটার দাম দু আনা? হ্যা দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই। শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়্‌রন্‌চেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মতো রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাকতেও হবে না। কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন। যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে। (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল করে টানতে হয়। এর দু টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভিরমি লাগে। কাজ নেই বাপু, থাক্। বাবু আগে আসুন। কিন্তু, বাবুর আসবার জন্যে তো কোনোরকম তাড়া দেখছি নে। সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে। এ দিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে যাবে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু, জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পার? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম।

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা, হোক-না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই? পয়সা তো আর নেই। তবে থাক্, বাবু আসুন, তার পরে দেখা যাবে।— সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না।— যাই হোক, এখন উদয় এলে যে বাঁচি।

ওই বুঝি আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি। আঃ, বাঁচা গেল। ওহে উদয়, ওহে উদয়! কই, না তো। তুমি কে হে?

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন। খিদেয় যে মারা গেলুম।

হোটেলের বাবু? কেরানিবাবু? কই, তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পার? অয়্‌স্টার প্যাটি?

পাঠান নি? বিল পাঠিয়েছেন? কৃতার্থ করেছেন আর-কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম।— আরে, মাইরি না। কী গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপু? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি— তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ওই চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন— ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভালো মুশকিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো! আমার নাম আমি জানি নে, তুমি জান! অত গোলে কাজ কী বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয়বাবু এখনি আসবেন।

বিধাতা সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত!—

সখি, কী মোর করম ভেল!
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল!

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা, আর-একজন পেলে বিষ। হোটেল-মন্থনেও কি একজন পাবে মজা, আর-একজন পাবে তার বিল! বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু, তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে? তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে।

কী বললে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে? তোমার তো বিবেচনা-শক্তি বেশ দেখছি!

সত্যি নাকি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু? কপালে কি সাইন্‌বোর্ড্ টাঙিয়ে রেখেছি? আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না?

নাম বদলেছি? আচ্ছা বাপু, শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে, বলো দেখি।

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখ নি? আচ্ছা, একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন ব'লে।

আরে ম'ল! আবার কে আসে? মশায়ের কোত্থেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসাবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়।

ঠাট্টা করছি নে মশায়, মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি।

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি— আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে— আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এরকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাড়িভাড়া-আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন? মাপ করবেন, ওইটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ওইখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ওই-যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ওইখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পরম বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনো কালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কী? আচ্ছা মশায়, হরিবাবু-নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি?

কী ! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে ? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল, কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে— আমি কারো কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন— গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইস্টুপিড— ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে— ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার !

আরে না মশায় ! আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায়, মনের খেদে, আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না ? অনেক দেরি হয়ে গেছে ? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল।

কিন্তু, এখন যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বলছেন। খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জাবোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনোরকম অসদ্ভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দু বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার ! ফের ! দেখো বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না ! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম।

ও বাবা ! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে ! খালি পেটে,

খিদের উপর, মারটা সয় না দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো। তোমাদের কার কত পাওনা আছে বলো।— ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে এক-পেট খিদেসুদ্ধ দৌড় মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওয়া নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু— এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণ রেখো।

তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি, তখন ফিরিয়ে আনা আরও কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর-একটু না দেখে যেতে পারছি নে।— উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি-সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই-যে এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক, বড্ড খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট করে কিছু খাবার কিনে আন তা হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু, প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম ক'রে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেছে?

না ? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও। [আহার

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা ব'লে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু এমন সুখ পাই নি। চন্দ্র, তুমিই সুধাকর বটে, কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি ?

হবে না ? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না ? তবে তো বড়ো বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড় ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না ; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম।— কী করব ! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে ? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না ? সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে— আগে থাকতে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে ! তোমাদের কল্যাণে যেরকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরো কী চাও ?

ও ! বকশিশ ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ওই খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তা হলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই ? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে গজভুক্তকপিত্থবৎ।

কিন্তু এই-যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায় ! একটা দামি জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ওই চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যেরকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তা হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন ?

পুলিস ? পুলিস আসছে ?

আমাকে পালাতে হবে ? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি! কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল! হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে! সবাই পালিয়েছে!

দেখো বাপু, গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই।

উঃ, কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায়, একটি পয়সা নেই। দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এতবড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি ? পেয়াদাসাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে ?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন-মেন ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী ? এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি ? ও বাবা, সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখনি নিয়ে যাও। কিন্তু, ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন ? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!

পৌষ ১৩০০

নূতন অবতার

প্রথম অঙ্ক

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(স্বগত) তুমি রুদ্‌তুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ। আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে। ওই পুকুরে দু বেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা তো সব শুনেছ দেখছি। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপরি-উপরি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখলুম— মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে আমার শিয়রের কাছে এসে বললেন, 'ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল, তাই তুই রুদ্‌তুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি। রুদ্‌তুর বক্‌শি কে তা জানিস? সত্যযুগে যে ছিল ভগীরথ সে'ই আজ বক্‌শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগলি পুলের উপর দিয়ে যে দিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের ওই পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান করেছি।' তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ রে! কী কাণ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কি না গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা! এমন পাপও করে! এখন বুঝতে পারছি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এলে। এ-সমস্তই দেবতার কাণ্ড। তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মতো বেরোতে লাগল; আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনো বুঝতে পারলুম না— মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকিলে লুটে খেলে!

অশ্রুবিসর্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি-
সহকারে কলিযুগের ভগীরথ-দর্শনে গমন

দ্বিতীয় অঙ্ক

রুদ্রনারায়ণ বক্‌শি

(স্বগত) তাই বটে!— ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল যে, আমি বড়ো কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে।

আর এও দেখেছি ব্রাহ্মণের ওই পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল ; থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত, ও পুকুরটা কোনোমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারী অসুবিধে হচ্ছে। একেবারে সাফ মনেই ছিল না যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি। উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমাগুলো তার কাছে লাগে কোথায় !

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জানতেম না! কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি, কী জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি তো কারো ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।— কে গো তুমি? পায়ের ধুলো? তা, এই নাও (পদ-প্রসারণ)। তুমি কী চাও গা? পাদোদক? এসো, এসো। নিয়ে এসো তোমার বাটি— এই নাও— খেয়ে ফেলো। ভোরবেলা থেকে পাদোদক দিতে দিতে আমার সর্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।— বাছা, তোমরা সব এসো, কিছু ভয় নেই। এতদিন আমাকে চিনতে পার নি সে তো আর তোমাদের দোষ নয়। আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না, যেমন চলছে এমনিই চলবে— তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্দুর বক্‌শি বলেই জানবে। (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না। কথাটা সর্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখো-না হিন্দুপ্রকাশে কী লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো— 'কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজ্জুগঞ্জের ভাগীরথী'— লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পরশুদিনকার বঙ্গতোষিণী-খানা আন্‌ দেখি, তাতেও বড়ো বড়ো দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কী? খুঁজে পাচ্ছিস নে? হারিয়েছিস বুঝি? হারায় যদি তো তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখব না, তা জানিস! সেদিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে দিলুম আল্মারির ভিতর তুলে রেখে দিস! পাজি বেটা! নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি বের করে দে! দে বের করে! যেখান থেকে পাস নিয়ে আয়, নইলে তোকে পুঁতে ফেলব বেটা!— ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশবাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে শুনিয়ে দাও তো, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভালো অভ্যেস নেই।— কে গা? মতি গয়লানী বুঝি? তা, এসো এসো, আমি পায়ের ধুলো দিচ্ছি— দুধের দাম নিতে এসেছ? এখনো শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুজ্জেকে মা গঙ্গা কি স্বপন দিয়েছেন সে-সব খবর রাখ না?

বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস, সে জলের মাহাত্ম্য জানিস? কেমন, সবার কাছে কথাটা শুনলি তো? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট করে একটা ডুব দিয়ে আয় গে যা।

এই এখনি যাচ্ছি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানি নে? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা, কী করব বলো। লোকজন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধুলোর প্রত্যাশায় এসেছে, এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে! আচ্ছা, উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস— যারা আমাকে দেখতে আসবে সব বসিয়ে রাখিস, আমি এলুম ব'লে। খবরদার! দেখিস যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়। বলিস ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বুঝলি? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম ব'লে।

রেখো, তুই যে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! তোর কি মাথা নোয় না নাকি? তোর তো ভারী অহংকার দেখছি। বেটা, তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই। পাজি বেটা, তোকে জুতো মেরে বিদায় করে দেব তা জানিস? সবাই আমাকে ভক্তি করছে, আর তুই বেটা এতবড়ো খ্রীস্টান হয়েছিস যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস নে! তোর পরকালের ভয় নেই? বেরো আমার বাড়ি থেকে।

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না? যে ভগীরথ মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ তো? ভুল করছ— ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে জেনো। বুঝেছ? মনে থাকবে তো? ভগীরথ, ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাস্টারের কাছে পড়ে নিয়ো। এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে দিই।

কই? ভাত কই? আমি আর সবুর করতে পারছি নে— দেশ দেশান্তর থেকে সব লোক আসছে। কী গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কী? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জল তোলা, সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কী করব বলো। আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারি নে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে এত কষ্ট করে গঙ্গা আনলুম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে— বটে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জানতেন।— কী! এতবড়ো আস্পর্ধা— তুই বিশ্বাস করিস নে! জানিস, তোকে বিয়ে করে তোর চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছি। বাপের বাড়ি যাবে? যাও-না! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আসতে দেব না। সেটা

মনে রেখো। ভাত আর আছে তো? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে যে দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে। যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলোবে না। রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এসো—, তোমরা সব চিঁড়ে আনতে দাও, পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো। কী করব বলো। দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে, তাদের ফেরাতে পারব না। কী বললে? আমার হাতে পড়ে তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল? কী বলব, তুমি মুর্খু মেয়েমানুষ, ওই কথাটা একবার দেশের ভালো ভালো পণ্ডিতদের কাছে বলো দেখি। তারা তখনি মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জ্ব'লে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন এ কথা কোনো শাস্ত্রের সঙ্গেই মিলছে না। তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চললুম।

(বাহিরে আসিয়া) দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধুলো নিয়ে পুজো করে বেলা করে দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্, আর কাজ নেই— তারা কি ছাড়ে! এসো, তোমরা একে একে এসো, যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও।— কী হে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা তো যেতে পারছি নে। দর্শন করতে সব লোকজন আসছে। এক-তরফা ডিক্রি হবে? কী করব বলো। আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপনে, তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলি নে? এমনি করেই অধঃপাতে যাবে। আয়, এইখানে গড় কর্, এই নে, ধুলো নে। যা।

তৃতীয় অঙ্ক

ওহে মুখুজ্জে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রসি দুয়েক তফাতে এলেই ভালো করতেন। তুমি তো দাদা, স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে যে দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগতে হচ্ছে। এক তো, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ভাবে আর পদ্মের পাতায় পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে, মাছগুলো মরে মরে ভেসে উঠছে, যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সেদিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের জানলা-দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে— সাত জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়। ছেলেগুলো যে ক'টা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে। কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হতে হল; তারা সব যমদূত,

ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখতে এলে পুরো ভিজিট আদায় করে ছাড়ে। সেও সহ্য হয়, কিন্তু খিড়কির ধারে ওই-যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ওইটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে। কাছাকাছি যে-সমস্ত বসতি ছিল সে-সমস্তই উঠে গেছে; রাত্তিরে যখন হরিবোল হরিবোল শব্দ ওঠে এবং শেয়ালগুলো ডাকতে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী তো বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে চাকর-দাসী টিঁকতে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দুপুরে দাঁত-কপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাই নে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুনলে বুকের মধ্যে দুড় দুড় করতে থাকে; বাড়িতে জনমানব নেই; গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে। আবার হয়েছে কী; ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে; সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়— সেদিন পশ্চিম থেকে দু-জন এসেছিল, তাদের কথাই বুঝতে পারি নে। বেটারা ভক্তি করলে বটে, কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে। এখান থেকে উঠে গেলে হয়তো ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয়কর্ম দেখতে সময় পাচ্ছি নে; আমার পত্তনি তালুকটার খাজনা বাকি পড়েছে, শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্ছে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। কী করি বলো তো দাদা? রুদ্দুর বকৃশি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোনো ল্যাঠাই ছিল না; ভগীরথ হয়ে কোনো দিক সামলে উঠতে পারছি নে, আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে! আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে; তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল আনবার জন্যে উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম; উকিল বললে, তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্যযুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়, স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে সমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে গেছে। মতি গয়লানীর সঙ্গে এক-রকম ঠিক হয়েছিল আমি পাদোদক দেব আর সে দুধ দেবে, আজ দু দিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধুলো ঝেড়ে যাবে। ভয়ে কিছু বলতে পারছি নে। পুকুরটা তো গেছেই, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর-দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে

নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চলবে? রাস্তায় বেরোলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে!— এই তো বিপদে পড়া গেছে। দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখতে হচ্ছে। দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড়ো বড়ো ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আমার ওই পুকুরের জল যেরকম হয়ে এসেছে আর দু দিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে ভেসে উঠবে; আমার মতো ভগীরথ ঢের মিলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টিঁকবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারি নে। তাই স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসত করতে হবে।

পৌষ ১৩০১

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি

৺গোকুলনাথ দত্ত। ইন্দ্রলোক

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখছি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। অনেক উচ্চে থাকার দরুন অক্সিজেন বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এ দিকে ধুলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চার যেরকম অবহেলা দেখছি তাতে আমি সন্দেহ করি ধুলোয় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এঁদের কানে এসে পৌঁচেছে কি না। এঁরা সেই-যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন, এর বেশি আর ইন্টেলেক্‌চুয়াল মুভ্‌মেণ্ট অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে, কনসার্ভেটিভ যত দূর হতে হয়।

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা, পণ্ডিতমশায়, ওই-যে সামবেদের গান হচ্ছে, আপনারা তো বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, কিন্তু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি? কী বললেন? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই? আপনাদের সমস্তই নিত্য? সুখের বিষয়! সুরবালকদের তারিখ মুখস্থ করতে হয় না! কিন্তু, বিদ্যাচর্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না? ইতিহাসশিক্ষার উপযোগিতা চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।— প্রথম, ক—

মনোযোগ দিচ্ছেন কি?— (স্বগত) গান শুনতেই মত্ত, তার আর মন দেবে কী করে? পৃথিবী ছেড়ে অবধি এঁদের কাউকে যদি একটা কথা শোনাতে পেরে থাকি! শুনছে কি না শুনছে মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই; একটা কথা বললে কেউ তার প্রতিবাদও করে না, এবং কারো কথার কোনো প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শুনেছি এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসর কাটাতে হবে। তা হলেই তো গেছি। আত্মহত্যা করে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে সুবিধাও নেই। এখানকার সাপ্তাহিক মৃত্যুতালিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে শুনলুম, এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার-নামক দুই বৈদ্য যে পদটি পেয়েছেন ওঁদের যদি বাঁধা খোরাক বরাদ্দ না থাকত তা হলে সমস্ত স্বর্গ ঝেঁটিয়ে এক পয়সা ভিজিট জুটত না। তবে কী করতে যে ওঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে বুঝতে পারি নে। কাউকে তো খরচের হিসাব দিতে হয় না, যার যা খুশি তাই হচ্ছে। থাকত একটা ম্যুনিসিপ্যালিটি, এবং নিয়মমতো কাজ হ'ত, তা হলে আমি তো সর্বাগ্রে ওই দুটি হেল্‌থ-অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লড়তুম। এই-যে রোজ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তার একটা হিসেব কোথাও আছে? সেদিন তো শচীঠাকরুনকে স্পষ্টই মুখের উপর জিজ্ঞাসা করলুম, স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার তো আপনার জিম্মায় আছে; পাকা খাতায় হোক, খসড়ায় হোক, তার কোনো একটা হিসেব রাখেন কি— হাতচিঠা কি রসিদ, কি কোনো রকমের একটা নিদর্শন রাখা হয়? শচীঠাকরুন বোধ করি মনে মনে রাগ করলেন; স্বর্গ সৃষ্টি হয়ে অবধি এরকম প্রশ্ন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। যা পাব্লিকের জিনিস তার একটা রীতিমত জবাবদিহি থাকা চাই, সে বোধটা এঁদের কারো দেখতে পাই নে। অজস্র আছে বলেই কি অজস্র খরচ করতে হবে! যদি আমাকে বেশি দিন এখানে থাকতেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম্ না করে আমি নড়ছি নে। আমি দেখছি, গোড়ায় দরকার অ্যাজিটেশন—

ওই জিনিসটা স্বর্গে একেবারেই নেই; সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এঁদের এই তেত্রিশ কোটিকে একবার রীতিমত বিচলিত করে তুলতে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড়ো রকমের দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পারে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব-এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমত নারদকে দিয়ে খুব এক চোট বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্যলোকে গুটিকতক নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়। আহা, এই কাজটি যদি আমি করে যেতে পারি তা হলে স্বর্গের এ চেহারা আর থাকে না। যাঁরা-সব দেবতাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসেন, প্রতি সংখ্যায় তাঁদের যদি একটি করে সংক্ষেপ-মর্তজীবনী বের করতে পারি তা হলে আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন্‌সেশন পড়ে যায়। এক-বার ইন্দ্রের কাছে আমার প্রস্তাবগুলো পেড়ে দেখতে হবে।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গে আমার গোপনে কিছু (অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও! আমি জানতুম না এঁরা সব এখানে আছেন— মাপ করবেন— আমি যাচ্ছি। একি, শচীঠাকরুনও যে বসে আছেন! আর, ওই বুড়ো বুড়ো রাজর্ষি-দেবর্ষিগুলোই বা এখানে বসে কী দেখছে! দেখুন মহেন্দ্র, স্বর্গে স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রচলিত করেন নি বলে এখানকার কাজকর্ম তেমন ভালো রকম করে চলছে না। আপনি যদি কিছুকাল এই-সমস্ত নাচ-বাজনা বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোনো কাজেরই বিলিব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কী করে যে কী হচ্ছে কিছুই দন্তস্ফুট করবার জো নেই। কাজ এমনতরো পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত যে, যন্ত্রের মতো চলবে এবং চোখ বুলিয়ে দেখবামাত্রই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নম্বরওয়ারি করে লিখে নিয়ে এসেছি; আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চোখও যদি এ দিকে ফেরান তা হলে— আচ্ছা, তবে এখন থাক্, আপনাদের গান-বাজনাগুলো নাহয় হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে।

(ভরত ঋষির প্রতি) আচ্ছা, অধিকারীমশায়, শুনেছি গান-বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে ক'টি প্রধান অঙ্গ আছে, অর্থাৎ সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা— কী বললেন? আপনারা এ-সমস্ত মানেন না? আপনারা কেবল আনন্দটুকু জানেন! তাই তো দেখছি— এবং যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। (কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া) ভরতঠাকুর, ওই-যে ভদ্র

মহিলাটি— কী ওঁর নাম— রম্ভা? উপাধি কী বলুন। উপাধি বুঝছেন না? এই যেমন রম্ভা চাটুজ্জে কি রম্ভা ভট্টাচার্য, কিম্বা ক্ষত্রিয় যদি হন তো রম্ভা সিংহ— এখানে আপনাদের ও-সব কিছু নেই বুঝি? আচ্ছা, বেশ কথা, তা, শ্রীমতী রম্ভা যে গানটি গাইলেন আপনারা তো তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন; কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন? একবার তো দেখছি ধৈবত লাগছে, আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে, আবার গোড়ার দিকে— ওঃ, বুঝেছি আপনাদের কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোনো নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো, ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু নিয়মটা থাকবেই। আপনাদের স্বর্গে যেটি আবশ্যক সেটি নেই, যেটা না হলে চলে তার অনেক বাহুল্য। সমস্ত সপ্তস্বর্গ খুঁজে কায়ক্লেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় তো তখনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে পড়ে। সকল বিষয়েই তাই দেখছি। ওই দেখুন-না ষড়ানন বসে আছেন, ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুণ্ডুর কোনোই অর্থ পাবার জো নেই। শরীরতত্ত্বের ক-খও যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুণ্ড নিতান্তই বাহুল্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ওঁর ছয় মাতার স্তন পান করতে ওঁকে ছটা মুণ্ড ধারণ করতে হয়েছিল? ওটা হল মাইথলজি, আমি ফিজিয়লজির কথা বলছিলুম। ছটা যেন মুণ্ডই ধারণ করলেন, পাকযন্ত্র তো একটার বেশি ছিল না। এই দেখুন-না, আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা— আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা আপনাদের কী অপরাধ করেছিল? আপনারা স্বর্গের লোক, বললে হয়তো বিশ্বাস করেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওই ছায়াটাকে কখনো পশ্চাতে, কখনো সম্মুখে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে কাটিয়েছি, ওটাকে পুষতে এক দিনের জন্যে সিকিপয়সা খরচ করতে হয় নি এবং অত্যন্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করি নি ওটাকে আপনারা ছেঁটে দিলেন, কিন্তু ছটা মুণ্ড, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, এতে খরচও আছে, ভারও আছে, অথচ সেটা সম্বন্ধে একটু ইকনমি করবার দিকে নজর নেই! ছায়ার বেলাই টানাটানি, কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহস্ত! সাধুবাদ দিচ্ছেন? দেবতাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন! সাধুবাদ আমাকে দিচ্ছেন না? শ্রীমতী রম্ভাকে দিচ্ছেন? ওঃ! তা হলে আপনি বসুন, আমি কার্তিকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

(কার্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গুহ, আপনি ভালো আছেন তো? আপনাদের এখানকার মিলিটারী ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌ সম্বন্ধে আমার দুটো-একটা খবর নেবার আছে। আপনারা কিরকম নিয়মে— আচ্ছা, তা হলে এখন থাক্‌। আগে আপনাদের অভিনয়টা

হয়ে যাক। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই-যে নাটকটি অভিনয় হচ্ছে এর নাম তো শুনছি 'চিত্রলেখার বিরহ'; এর উদ্দেশ্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য দু রকমের হতে পারে, এক জ্ঞানশিক্ষা, আর-এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয় এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নয় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভালো করলে ভালো হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন বিবর্তনবাদের নিয়ম-অনুসারে পরমাণুপুঞ্জ কিরকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল, কিম্বা আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে অংশে পূর্ববর্তী কর্মের ফল সেই অংশে বদ্ধ এবং যে অংশে পরবর্তী কর্মকে জন্ম দেয় সেই অংশে মুক্ত এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে— কাব্যে যখন সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় তখন কাব্যের উদ্দেশ্যটি হাতে হাতে পাওয়া যায়। চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্‌টি আছে? আপনি তো বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন; যেরকম দেখছি দেবলোকে যদি ফিজিয়লজির নিয়ম বলে একটা কিছু থাকত তা হলে এখনি আপনার দ্বাদশ চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'ত। যাই হোক কার্তিক, এ বড়ো দুঃখের বিষয়, স্বর্গে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য-নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্ছে, কিন্তু যাতে গবেষণা কিম্বা চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছুই বেরোচ্ছে না। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) দেখছি 'চিত্রলেখার বিরহ' নাটকখানা আপনার বড়োই ভালো লেগে গেছে, তা হলে অন্য প্রসঙ্গ থাক্‌ আপনি ওইটেই দেখুন।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়োই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা, নন্দনকাননের পারিজাতকুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে, সেইখানে একটা সভা স্থাপন করি, তার নাম দিই 'শতক্রতু ডিবেটিং ক্লাব'। তাতে আপনারও একটা নাম থাকবে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্‌, মাপ করবেন— আমার অভ্যাস নেই— আমি অমৃত খাই নে— রাগ যদি না করেন তো বলি, ও অভ্যাসটা আপনাদের ত্যাগ করা উচিত। আমি দেখেছি, দেবতাদের মধ্যে পানদোষটা কিছু প্রবল হয়েছে। অবশ্য, ওটাকে আপনারা সুরা বলেন না, কিন্তু বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতেও দেখতুম অনেকে মদকে ওআইন বলে কিছু সন্তোষলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এইমাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভালো শুনতে হল? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ওই-সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন তো জানতে পারবেন, ওগুলো এখন

নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। আমরা কিরকম সম্বোধন করি জানতে চাচ্ছেন? আমরা কখনো মাতৃসম্বোধনও করে থাকি, কখনো বা বাছাও বলি, আবার সময়-বিশেষে ভালোমানুষের মেয়ে বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনোটিই আপনি এই-সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না? তা না করুন, এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কী বললেন? স্বর্গে সুরুচিও নেই, কুরুচিও নেই? প্রথমটি যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করি নে; দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি, কিন্তু আপনারা তো আমার কোনো আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখুন শচী, আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গসমাজের ভিতরে যে-সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করবার জন্যে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত? আপনারা স্বর্গাঙ্গনারাও যদি এ-সকল বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন তা হলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকবে। ওঁদের সম্বন্ধে যে-সকল অপযশের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই; মধ্যে মধ্যে যদি সভা আহ্বান করে এ-সকল বিষয়ে আলোচনা হয়, আপনারা যদি সাহায্য করেন, তা হলে— কোথায় যান? গৃহকর্ম আছে বুঝি? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভঙ্গ) মহা মুশকিলে পড়া গেল? কাউকে একটা কথা বললে কেউ শোনেও না, বুঝতেও পারে না। (ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবন সহস্রলোচন শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে?

ইন্দ্র। (কাতর স্বরে) সাড়ে পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শো নিরেনব্বই বৎসর।

গোকুলনাথ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার একসঙ্গে সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস-পতন

ভাদ্র ১৩০১

স্বর্গীয় প্রহসন

ইন্দ্রসভা

বৃহস্পতি। হে সৌম্য, তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই? আরও কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্মমৃত্যুর দ্বারা মর্তলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোনো উপায় নাই; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

ইন্দ্র। হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে মনসা শীতলা ঘেঁটু -নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে?

ইন্দ্র। দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে কেবল ত্রিভুবনের সম্মতি-ক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই যে, মর্তলোকেই দেবতাদের নির্বাচন হইয়া থাকে। এক কালে আর্যাবর্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধানপদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে সরস্বতী-দৃশদ্বতী-তীরের প্রত্যেক যজ্ঞহুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবির্ঘৃত কেবলমাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। বৃত্রনিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃত-পানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে, সেই জন্যই নরলোকে হোমাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, নতুবা নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেবজঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শূলবেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্যপদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্তের

ভক্তি হইতেই স্বর্গ উর্ধ্বলোকে উদ্‌বাহিত হইতে থাকে ; সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া যায় তবে, হে দ্বিজসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত নন্দনবনবেষ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্তের সহিত যোগ-প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নবনির্বাচিত দেবতাগুলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে ত্রিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। মেঘবাহন, সে-সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে যে-সকল নূতন দেবতা মর্ত হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। সম্প্রতি ঘেঁটুপ্রমুখ যে-সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সুরসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভারার্পণ করা হয়।

ইন্দ্র। বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্মন্‌দেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতি দিনের সদ্য-আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বল লাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে দেবমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন।

বৃহস্পতি। অহো দুরবৃত্তা নিয়তি! মর্তলোকের প্রসাদলাভলালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশ আপন দেবমর্যাদা বিসর্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্তি ধারণ করিয়াছেন! গম্ভীরপ্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন-পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্ত্রীপল্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সে-সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন বোধ করি দেবাসনে উপদেবতাগণের অধিরোহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধৈর্যকঠিন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ভগবন্ উড়ুপতে, স্বর্গলোকে তো কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই, তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করো। তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সুধাংশুমালিন্, সুহৃদ্‌গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর অনুগ্রহ সেজাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ করো। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর-কেহ একাকী সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে, অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে, কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে। তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাবশ্যক পূরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পার না।

চন্দ্র। যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম, তবে বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে, অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ?

চন্দ্র। সখে, সত্য বলিতেছি কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ?

চন্দ্র। বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ-পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনোরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সখে, ধন্য তোমার সাহস! তবে তোমার ভয় কিসের?

শশব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ

দূত। জয়োস্তু! দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) কেন? দেবগণ তাঁহার নিকট কী কারণে অপরাধী হইয়াছে?

দূত। মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী -নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর, কমলবনে চিঙ্গটি-নামক কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য না হইয়া কমলকলিকায় অঞ্চল পূর্ণ করিয়া তিন্তিড়িসংযোগে কটুতৈলে অম্লব্যঞ্জন-রন্ধন-পূর্বক তীরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলস্থালী সরোবরের জলে মার্জনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ-পর্যন্ত মানসসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই। [দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন

ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনোরূপ অভাব নাই? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্বদা আপনাদের আদেশ-পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? সিদ্ধগন্ধর্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন করে? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে? নন্দনবনের সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে?

[দেবীগণের উচ্চহাস্য

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিন্‌সে কী বকছে ভাই?

ঘেঁটু। পুরুতঠাকুরের মতো মন্তর পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্তা? তোমার মন্তর পড়া হয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো! আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা! ঘেঁটো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি!

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয়! [দেবীগণের উচ্চহাস্য

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যা-দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সুকৃতিফলে আপনকার সকলের স্মিতদশন-

ময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

ঘেঁটু। আরে, রাখো, ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কী সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারি নে। তোমার শচী-গিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক-থাল গোবরের লাড্ডু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। বোধ করি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য না হইতে পারে।

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই! আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক! আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দরমহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে আছেন, আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বললুম, বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না! যা বলতে হয় তা বলেছি। ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার! আদর করে বেশ নামটি দিয়েছ যা হোক। আনো বদ্যি! কিন্তু বদ্যিতে করবে কী ভাই! কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি— আমি কি তেমনি মেয়ে!

ঘেঁটু। (ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কী গো, ইন্দির দা? মুখে যে রা'টি নেই! রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে নাকি?

ইন্দ্র। (সসংকোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন-নির্দেশ-পূর্বক) দেব, আসনগ্রহণে অনুমতি হউক।

ঘেঁটু। এই-যে, এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন)

দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই ঘেঁটু।

[বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্তৃক অব্যক্ত কাতরধ্বনি উচ্চারণ

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায় ?

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্তৃপ্রসাদন-ব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীননয়নে—

শীতলা। কী বললে ? শালী ? তা, ভাই, তাই সই। তোমার চাঁদমুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা, শালী যদি বললে তবে কানমলাটিও খাও।

[চন্দ্রের পার্শ্বে একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করুণস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়ের অরুণরাগ এখনো তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে।

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ করিয়া স্বগত) ম'লো ম'লো! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে ম'লো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে দেখো-না। এতগুলো পুরুষ-মানুষের সামনে লজ্জাও নেই! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে! উনিও বড়ো কসুর করেন নি। কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে যেরকম নির্লজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে যাই আর-কি। কার্তিক কোথায় লুকোবে ভেবে পায় না। ওই তো চেহারা, ওই নিয়ে এত ভঙ্গিও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন ? যেন সাপ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে! কার্তিকের ওখানে ঠাঁই হল না নাকি ?

[সুরসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ

ইন্দ্র। (শশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সম্বরণ করো! ক্রোধ সম্বরণ করো! অয়ি অসূয়াতাম্রলোচনে, অয়ি গলদ্‌বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে, অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরকে পঞ্চম স্বরে নম্র করিয়া আনো। অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা ? ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে। থাকত ওলাবিবি, তা হলে আরও জমত। তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে।

ইন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পৌলমী !

[মনসার দ্রুতবেগে সভাত্যাগ এবং শীতলার পুনশ্চ চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন

বীণাপাণির প্রবেশ

বীণাপাণি। দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। [প্রস্থান

বৃহস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি। [প্রস্থান

অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ

অশ্লেষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপরূপ অভিনব সপ্তদশম কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি!

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুষ রাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি স্ত্রী রাহু সৃজন করিয়াছেন, ইঁহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

অশ্লেষা। আর্যপুত্র, এই ভদ্রললনা অনতিপূর্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তোমার শ্বশুরকুলকে উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব কুৎসা-দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্যপুত্রকে তাঁহার নবতর শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম। (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণী, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক।

[প্রস্থান

শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্যে, শুভ আগমন হউক।

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ঈস! ভারী খাতির যে! মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষ-মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখি নি।

[ঘেঁটুকে ইন্দ্রের রামপার্শ্বে শচীর নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে শচীদেবী কর্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ

ঘেঁটু। (শচীর অনতিদূরে গমন করিয়া সহাস্যে) বউঠাকরুন, আমার দাদাকে কী মন্তর পড়ে দিয়েছ বলো দেখি! একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি

উঠলে ওঠে, তুমি বসলে বসে। বলি, একটা কথাই কও। (গান) 'কথা কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী!'

ইন্দ্র। দেব ঘেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক। দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে।

ঘেঁটু। ঈস! দেখো! দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি, তোমার যে আর গায়ে সইল না! এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়! কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।—কাজ নেই ভাই, আবার শাপ দেবে। তোমরা দু জনে বোসো, আমি যাই।

[বলপূর্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা

ইন্দ্র। (ঘেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ!

ওলাবিবির প্রবেশ

ওলাবিবি। (শচীর প্রতি) তাই বলি যায় কোথায়! অমনি বুঝি সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ? তা, নাগাও-না। তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাই নে।

শচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পূজার অনবসরক্রমে চক্রপাণির নিকটে অপরাধী হইয়া আছি। [উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে—লক্ষ্মীদেবী ··· হায়, বিপৎকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়!

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক তো ফের কানমলা খাবে।

চন্দ্র। স্ফুরৎকনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না, যদি অনুমতি কর তো দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে! [কান মলিতে উদ্যত

মনসার পুনঃপ্রবেশ

[শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ। ঘেঁটু ওলা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগদান

চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক-অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে। [দ্রুতপদে প্রস্থান

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বশীকরণ

প্রথম অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন ? স্ত্রী তো তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়। ওইটুকু পৌত্তলিকতা, রাখলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। স্ত্রী-পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীজাতি তো বিদায় হন না— স্ত্রীকে ছাড়লে স্ত্রীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন, স্ত্রীপূজার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে ?

অন্নদা। তবে শোনো। আমার শাশুড়ি ছিলেন না, শ্বশুর ভয়ংকর হিন্দু ছিলেন। যখন শুনলেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী করে কাশীতে গিয়ে বাস করলেন। তার পরে শুনছি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবতাতেও তৃপ্তি হয় নি, তার উপরে অল্‌কট, ব্লাভাট্‌স্কি, অ্যানি বেসাণ্ট, সূক্ষ্মশরীর, মহাত্মা, প্লান্‌চেট, ভূতপ্রেত কিছুই বাদ যায় নি—

আশু। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশু। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই— তার পশ্চাতে এত বড়ো রেজিমেণ্ট্‌ লেগেছে, সে আর টিঁকল না। শুনেছি আমার শ্বশুর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত-উদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন।

আশু। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে-না, যদি উদ্ধার করেন।

অন্নদা। ঠিকানাও জানি নে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশু। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে ?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশু। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা জিনিসটা দুর্লভ বটে।

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কী বলো দেখি। তোমার তো আইবড়োলোক-প্রাপ্তির বিধান কোনো শাস্ত্রেই লেখে না। তার বেলা

চুপ। থিওসফিতে তোমাকে খেলে। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণায়াম হঠযোগ সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলা এ-সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর।

আশু। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি— তা নয়। এ-সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কিনা তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অবিশ্বাসকেও তো প্রমাণের উপর স্থাপন করতে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই করো। মরীচিকা-স্থাপনের জন্যে পাথরের ভিত্তি গাঁথো। আমি এখন চললেম।

আশু। কোথায় যাচ্ছ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা তো জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও, শুভকার্যে বাধা দেব না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বাড়িওয়ালা ও তাহার স্ত্রী

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে, তবে অমন চেহারা কেন?

বাড়িওয়ালা। দেখতে শুনতে তাড়কা-রাক্ষসীর মতো না হলেই বুঝি আর মাতাজি হয় না।

স্ত্রী। হবে না কেন? কিন্তু তা হলে কি এই সমর্থবয়সে স্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মতো বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি করতে বেরোত? তা হলে কি পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়ত? আর, এত টাকাই বা পেলে কোথায়?

বাড়িওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে তাদের যদি টাকা না হবে, চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে? রোসো না, ওঁর কাছে মন্তর-টন্তর-গুলো শিখে নেওয়া যাক-না।

স্ত্রী। বুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কী শুনি? কাকে বশ করবে?

বাড়িওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পারলেম না।

স্ত্রী। তিনি কে?

বাড়িওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস করে নাম বলব।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। এ বাড়িতে আমার থাকার সুবিধা হচ্ছে না। এর চেয়ে বড়ো বাড়ি আমাকে দিতে হবে।

বাড়িওয়ালা। এ বাড়ি ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড়ো বাড়ি আছে। সেটা বড়ো বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা, ভাড়া বেশি দেব, কিন্তু সেই বাড়িতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়িওয়ালা। সবে পরশু দিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্ সদরআলার বিধবা স্ত্রী— পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়িতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপঞ্চাশ নম্বর! ঠিক আমি যা চাই। তোমার এ বাড়ির নম্বর ভালো নয়।

বাড়িওয়ালা। বাইশ নম্বর ভালো নয় মাতাজি? কারণটা কী বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝতে পারছ না— দুয়ের পিঠে দুই—

বাড়িওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দুয়ের পিঠে দুইই তো বটে। এতদিন ওটা ভাবি নি।

মাতাজি। দুইয়েতে কিছু শেষ হয় না, তিন চাই। দেখো-না আমরা কথায় বলি, দু-তিন জন—

বাড়িওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা তো বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বললেই চুকে যেত, তা হলে তার সঙ্গে আবার তিন বলব কেন? বুঝে দেখো।

বাড়িওয়ালা। আমাদের কী বা বুদ্ধি, তাই বুঝব। সবই জানতুম, তবু তো বুঝি নি।

মাতাজি। তাই, ওই দুইয়ের পিঠে দুই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্ছে না।

স্ত্রী। (আত্মগত) বেঁচে থাক্ আমার দুয়ের পিঠে দুই। মন্ত্র সফল হয়ে কাজ নেই।

মাতাজি। উনপঞ্চাশের মতো এমন সংখ্যা আর হয় না।

বাড়িওয়ালা। (জনান্তিকে) শুনলে তো গিন্নি?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কী? তোমার উনপঞ্চাশ যে অনেক কাল হল পেরিয়েছে।

বাড়িওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়িতে যেতে হবে?

মাতাজি। কাল উনত্রিশ তারিখে মঙ্গলবার পড়েছে এমন দিন আর পাওয়া যাবে না।

বাড়িওয়ালা। ঠিক কথা। কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে। কী আশ্চর্য! তা হলে তো কালই যেতে হচ্ছে বটে। তা'ই ঠিক ক'রে দেব। (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার এই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কী ব'লে? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়িই বা পায় কোথায়?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়িতে এনেই রাখো-না! আমরা নাহয় কিছুদিন ঝামাপুকুরে জামাইবাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার ওই মন্তর-জানা মেয়েমানুষকে এখানে রেখে কাজ নেই। বিদেয় করে দাও। ছেলেপিলের ঘর, কার কখন অপরাধ হয়, বলা যায় কি?

বাড়িওয়ালা। সেই ভালো। তাদের কোনোরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক্। বলি গে, পাড়ায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে প্লেগ-হাঁসপাতাল বসবে।

তৃতীয় অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

অন্নদা। তোমার ওই টাটকা লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে করলে যে হে! তোমার ঘরে আসা ছাড়তে হল।

আশু। টাটকা লঙ্কার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে?

অন্নদা। ওই-যে তোমার তর্কালংকারের বকুনি। লোকটা তো বিস্তর টিকি নাড়লে, মাথামুণ্ডু কিছু পেলে কি?

আশু। মাথামুণ্ডু নইলে শুধু-টিকি নড়বে কোথায়? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা করে শুনতে, তবে বুঝতে।

অন্নদা। যদি বুঝতেম, তবে শ্রদ্ধা করতেম। তুমি আশু, ফিজিকাল সায়ান্সে এম-এ দিয়ে এলে— তুমি যে এত ঘন ঘন টিকি-নাড়া বরদাস্ত করছ এ যদি দেখতে পায় তবে প্রেসিডেন্সি কালেজের চুনকাম-করা দেওয়ালগুলো বিনি-খরচে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আজ কথাটা কী হল বুঝিয়ে বলো দেখি।

আশু। পণ্ডিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন।

অন্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খুব দরকার হয়ে পড়েছে। তর্কালংকারমশায়

বলছিলেন, বিবাহের পূর্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্তব্য। যুক্তিটা কী দিচ্ছিলেন, ভালো বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বলছিলেন, সকল জিনিসের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হলে তখন সূর্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করবার সময় আসে। বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতি অনুকরণে বাইরে টানাটানি না করে তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্তব্য। তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেয়ো না। সে যখন স্বভাবতই নিজে অঙ্কুরিত হয়ে তার অর্ধমুকুলিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখনই তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। বিলাতি প্রথা-মতে বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করি নি; হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে আমি তার কোনো খোঁজ পাই নি, তার পরে অঙ্কুরিত হল কি না হল তারও তো কোনো ঠিকানা পেলেম না। এবারে উল্টোরকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা।

আশু। পরীক্ষার দিন কবে ?

অন্নদা। কাল।

আশু। স্থান ?

অন্নদা। উনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গলি।

আশু। নম্বরটা তো ভালো শোনাচ্ছে না।

অন্নদা। কেন ? উনপঞ্চাশ বায়ুর কথা ভাবছ ? সে আমাকে টলাতে পারবে না— তুমি হলে বিপদ ঘটত।

আশু। পাত্র ?

অন্নদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি ঘটককে ব'লে রেখেছি যে ভালো করে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশু। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হলে ?

অন্নদা। তোমাদের মতো আমি নাম দেখে ভড়কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চমকাও কেন ভাই ?

আশু। তবু একটা প্রিন্সিপল আছে তো ? বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বলতেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে প্রিন্সিপলও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও

আসছে না,প্রিন্সিপলও রইল ; অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ করব,প্রিন্সিপল-জুজুকে ডরাব না।

রাধাচরণের প্রবেশ

রাধাচরণ। আশুবাবু !

আশু। কী হে রাধে ?

রাধাচরণ। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে মন্ত্র নিয়ে তর্ক করলেন— এক-একটা শব্দের যে এক-এক-প্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কী রাধে ? তা হলে আশুর অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি ! এখনো দুটো-একটা জায়গায় ঠেকছে !— শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালির ছেলে বিশ্বাস কর না !

রাধাচরণ। বলুন তো অন্নদাবাবু ! তা হলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ— এগুলো কি বেবাক গাঁজাখুরি !

অন্নদা। তাও কি কখনো হয় ? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে ?

রাধাচরণ। পশ্চিম থেকে এক জন যোগসিদ্ধ মাতাজি এসেছেন। শুনেছি তিনি মন্ত্রের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখতে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি দেখা দেন না; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশুবাবু, আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশু। তিনি থাকেন কোথায় ?

রাধাচরণ। বাইশ নম্বর ভেড়াতলায়।

অন্নদা। বাইশ নম্বরটা উনপঞ্চাশের চেয়ে ভালো হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভালো ঠেকছে না। একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে ভেড়াতলা। মাতাজির কাছে মুণ্ডুজিটি খুইয়ে এসো না।

আশু। আরে ছি ! কী বক তার ঠিক নেই। তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে মুণ্ডুর ভাবনা ভাবতে হয় না। তুমি বুঝেসুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাবছ বাইশ একেবারেই নির্বিষ। তা নয় হে। বিষের উপরেও দুই মাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ। আপাদমস্তক জর্জর হয়ে ফিরবে।

চতুর্থ অঙ্ক

বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী

শ্যামা। পেলেগ শুনে ভয়ে বাঁচি নে। তাড়াতাড়ি ক'রে পালিয়ে তো এলুম। কিন্তু অন্নদা বলে ছেলেটির আজ যে সেই উনপঞ্চাশ নম্বরে আসবার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে ঠিক এখানে আসতে পারবে! এত ক'রে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করলেম, সব মাটি হবে না তো! যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না। ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নিরুপমাকে ভালো করে দেখে-শুনে নিতে চায়, ওর পড়াশুনো গান-বাজনা সব পরীক্ষা করবে— তা করুক। কর্তা তো নিরুপমাকে সেই রকম করেই শিখিয়েছেন। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমাদের কখনো তো বন্ধ ক'রে রাখেন নি। তবু কলকাতার ছেলে কী রকম জানি নে। ভয় হয়, আমাদের ধরন-ধারন দেখে হয়তো অভদ্র মনে করবে! তারা মেয়ের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করে না কি, কে জানে! হয়তো ইংরেজিতে গুড্‌মর্নিং বলে! শুনেছি তাদের নিজের হাতে চুরুট জ্বালিয়ে দিতে হয়— এ-সব তো পারব না। ঘটক বললে, ছেলেটি হ্যাট-কোট পরে। আমার মেয়ে আবার ফিরিঙ্গির সাজ দু চক্ষে দেখতে পারে না। কী রকম যে হবে, বুঝতে পারছি নে। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে রাজি হবে তো?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মাঠাকরুন, একটি বাবু এসেছেন। আমি তাঁকে বললেম বাড়িতে পুরুষ-মানুষ কেউ নেই। তিনি বললেন, তিনি মার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটি এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্ছে— কলকাতার ছেলে, তার সঙ্গে কিরকম করে চলতে হবে! কী জানোয়ারই মনে করবে!

আশুর প্রবেশ

[শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে গো! এ তো শেক্‌হ্যাণ্ড করে না। বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধুতিচাদর পরে এসেছে!

আশু। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করি নি। বড়ো অনুগ্রহ করেছেন।

শ্যামা। (সস্নেহে সপুলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কী!

আশু। স্নেহ রাখবেন। আশীর্বাদ করবেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই।

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শুনে আমার কান জুড়োল, আমি নিশ্চয়ই অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশু। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নিরুপমা-সম্পদ লাভ করেছেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। অনেক সন্ধান করে যোগ্যপাত্র পেয়েছি, এখন দিতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হই।

আশু। (শ্যামার পদধূলি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ করলেন; এত সহজেই যে ফললাভ করব, এ আমি স্বপ্নেও জানতুম না।

শ্যামা। বল কী বাবা, তোমার আগ্রহ যত আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি।

আশু। তা হলে যে কামনা করে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈকি বাবা, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আশু। আপত্তি নেই মাতাজি? শুনে বড়ো আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও।

আশু। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতোই স্নেহ দেখালেন।

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতোই দেখবে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা। আমার তো ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মতো থাকবে।

আহার্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

আশু। করেছেন কী! এত আয়োজন!

শ্যামা। আয়োজন আর কী করলেম? আজই ঠিক আসতে পারবে কিনা মনে একটু সন্দেহ ছিল, তাই—

আশু। সন্দেহ ছিল? আপনি কি জানতেন আমি আসব?

শ্যামা। তা জানতেম বৈকি।

আশু। (আত্মগত) কী আশ্চর্য! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিলেন? তবু অন্নদা যোগবলে বিশ্বাস করে না! তাকে বললে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে। [আহারে প্রবৃত্ত

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুকরো। যেমন কার্তিকের মতো দেখতে তেমনি মধু-ঢালা কথা। আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাকছে। পশ্চিম থেকে এসেছি কিনা, তাই বোধ হয় মা না বলে মাতাজি বলছে। (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা!

আশু। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হলে একটু বোসো, আমি ডেকে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

আশু। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রের ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটু বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। এরই মধ্যে মাতাজির মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্ছে যেন মাকে পেলেম। এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি স্নিগ্ধ দৃষ্টি-দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিষিক্ত করে দিয়েছেন। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্র-স্থানীয় করে নিয়েছেন, এ যেন পূর্বজন্মের একটা সম্বন্ধের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ

আশু। (স্বগত) আহা, কী সুন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন মূর্তিমতী। এঁর মুখে কোনো মন্ত্রই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লজ্জা কোরো না মা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন উত্তর দিয়ো।

আশু। লজ্জা করবেন না। মাতাজি আমার প্রতি যেরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতোই দেখবেন। (আত্মগত) মেয়েটি কী লাজুক! আমার কথা শুনে আরও যেন লাল হয়ে উঠল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র করো।

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জানতে উৎসুক হয়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অল্প, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে— তবে—

আশু। যত অল্পই হোক মাতাজি, আমাদের মতো লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোনো পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট তখন মেয়েকে পছন্দ করেছে বলেই বোধ হচ্ছে। বাঁচা গেল, আমার বড়ো ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যে) নিরু, একটি গান শুনিয়ে দাও তো মা!

আশু। গান! এ আমার আশার অতীত। আপনি বোধ হয় পূর্বে থেকেই জানেন, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভালোবাসি নে। (স্বগত) অন্নদার মতো

এতবড়ো সন্দেহী, সে থাকলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পারত। (প্রকাশ্যে নিরুপমার প্রতি) আপনারা আমাকে এক দিনেই চিরঋণী করেছেন, যদি গান করেন তবে বিক্রীত হয়ে থাকব।

নিরুপমার গান

আমি কী বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন!
চিত্তে এসে দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন।
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে করো সমর্পণ
তব স্পর্শে পরশরতন।
তোমার গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
একেবারে দিব বিসর্জন
চরণে হৃদয় প্রাণ মন।

আশু। (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই। বশীকরণের আর কী বাকি রইল! কন্যাটি দেবকন্যা। (প্রকাশ্যে) মাতাজি!

শ্যামা। কী বাবা?

আশু। আমাকে আপনার পুত্র করেই রাখবেন, এমন সুধাসংগীত শোনবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। যা পাওয়া গেল এই আমি পরম লাভ মনে করছি। মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি। এখন বুঝতে পারছি, মন্ত্রের কোনো দরকার নেই।

শ্যামা। অমন কথা বোলো না বাবা! মন্ত্রের দরকার আছে বৈকি। নইলে শাস্ত্রে—

আশু। সে তো ঠিক কথা। মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে। আমি বলছিলেম মন্ত্র পড়লেই যে মন বশ হয় তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না। (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ভারি লাজুক!

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি খুব ভালো। কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বলে বোধ হয়। মন বশ করার কথাগুলো শাশুড়ির সামনে না বললেই ভালো হ'ত।

আশু। কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্ছে আমি বলি, তার পরে—

শ্যামা। তা বাবা, সে-সব কথা এখন থাক্। আগে—

আশু। আমি বলছিলেম, গানে যে মন বশ হয় সেও তো শব্দমাত্র; মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে তা হলে মন্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কী বলে?

শ্যামা। ঠিক কথা। মন্ত্রটা মানাই ভালো।

আশু। (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ-সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু শাব্দী শক্তির সঙ্গে আত্মার যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে তার স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন, তর্কালংকারমশায় বলেন সে অনির্বচনীয়। শাস্ত্রে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কী? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে ব্রহ্ম তা নয়; কিন্তু ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ যেন নিকটতম। (নিরুপমার প্রতি) আপনি তো এ-সকল বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, আপনার কি মনে হয় না রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয়? সেই জন্যই এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি কী বলেন? (স্বগত) মেয়েটি ভারী লাজুক!

শ্যামা। বলো না মা, যা জিজ্ঞাসা করছেন বলো। এত বিদ্যে শিখলে, এই কথাটার উত্তর দিতে পারছ না?— বাবা, প্রথম দিন কিনা, তাই লজ্জা করছে। ও যে কিছু শেখে নি তা মনে কোরো না।

আশু। ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখশ্রীতেই প্রকাশ পাচ্ছে। আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করছি নে।

শ্যামা। নিরু, মা, একবার ও ঘরে যাও তো। [নিরুপমার প্রস্থান

দেখো বাবা, মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্ছে, তুমি কিছু মনে কোরো না।

আশু। মনে করব! বলেন কী! আপনার কথা শুনতেই তো এসেছিলেম— বাচালের মতো কেবল নিজেই কতকগুলো বকে গেলেম। আমাকে মাপ করবেন।

শ্যামা। তোমার যদি মত থাকে তা হলে একটা দিনস্থির করতে হচ্ছে তো?

আশু। (স্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ বৃহস্পতি-বার, তাই বোধ হয় হল না। (প্রকাশ্যে) তা, আসছে রবিবারেই যদি স্থির করেন?

শ্যামা। বল কী বাবা? আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে তো কেবল দুটো দিন আছে।

আশু। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে?

শ্যামা। তা হবে বৈকি বাবা; যথাসাধ্য করতে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শুভদিন স্থির করতে হবে তো।

আশু। তা বটে, শুভদিন দেখতে হবে বৈকি। আসল কথা, যত শীঘ্র হয়। আমার যেরকম আগ্রহ, ইচ্ছে হচ্ছে, এই মুহূর্তেই—

শ্যামা। তা, আমি অনর্থক দেরি করব না বাবা! আসছে অঘ্রান মাসেই হয়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হয়ে এসেছে, ওকেও তো আর রাখা যাবে না।

আশু। ওঁর বিবাহ হয়ে গেলেই বুঝি—

শ্যামা। তা হলে আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশু। তা হলে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক করে নিতে হবে।

আশু। তবে দিন ক্ষণ দেখুন।

শ্যামা। তুমি তো রাজি আছ বাবা?

আশু। বিলক্ষণ! রাজি যদি না থাকব তো এখানে এলেম কেন! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস করছি! আমার সেরকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মতো এ-সকল বিষয় নিয়ে তামাশা করি নে।

শ্যামা। তোমার আর মত বদলাবে না?

আশু। কিছুতেই না। আপনার পদস্পর্শ করে আমি বলছি, আপনার কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে এসেছি তা আমি গ্রহণ করে তবে নিরস্ত হব।

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে।

আশু। আপনি কী চান বলুন।

শ্যামা। আমি কী চাইব বাবা? তুমি কী চাও, সেইটে বলো।

আশু। আমি কেবল বিদ্যে চাই, আর কিছু চাই নে।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বলতেই হবে। ছি ছি ছি, বিদ্যে-সুন্দরের কথা আমার কাছে পাড়লে কী করে! আমার নিরুকে বলে কিনা বিদ্যে! (প্রকাশ্যে) তা হলে পানপাত্রটার কথা কী বল বাবা?

আশু। (স্বগত) পানপাত্র! এঁর দেখছি সমস্তই শাক্তমতে। এ দিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপাত্র। এইটে আমার ভালো ঠেকছে না। (প্রকাশ্যে) তা, মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না— অবশ্য যে কাজের যা অঙ্গ তা করতেই হয়— কিন্তু ওই-যে পানপাত্রের কথা বললেন, ওটা তো আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা, তোমরা একালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি তো ওতে কোনো দোষ দেখি নে—

আশু। আপনি ওতে কোনো দোষই দেখেন না! বলেন কী মাতাজি!

শ্যামা। তা, নাহয় পানপাত্র রইল, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন বিবাহের কথা তো পাকা?

আশু। কার বিবাহের কথা?

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক করলে বাপু! এতক্ষণ কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করছ কার বিবাহের কথা! তোমারই তো বিবাহের কথা হচ্ছিল; কেবল পানপাত্রের কথা শুনেই তুমি চমকে উঠলে। তা, পানপাত্র নাহয় নাই হল।

আশু। (হতবুদ্ধিভাবে) ও, হাঁ, তা বুঝেছি, তাই হচ্ছিল বটে! (স্বগত) মস্ত একটা কী ভুল হয়ে গেছে। না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি। কী করা যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক দিন এ-সব কথা খোলসা করে আলোচনা করা যাবে। কী বলেন?

শ্যামা। খোলসার আর কী বাকি রেখেছ বাবা! আর-এক দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে! তাড়াতাড়ি তো তুমিই করছিলে। আসছে রবিবারেই তুমি দিন স্থির করতে চেয়েছিলে।

আশু। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশুনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম, তার গানও শুনলে, এখন পানপাত্রের কথা শুনেই যদি বেঁকে দাঁড়াও তা হলে তো আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। তোমাকেই বা লোকে কী বলবে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভালো! আমার নিরু তোমার কাছে কী দোষ করেছিল যে— [ক্রন্দন

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ

নিরুপমা। মা, কী হয়েছে মা, অমন করে কাঁদছ কেন!

আশু। (স্বগত) কী সর্বনাশ! আমাকে এঁরা সবাই কী মনে করবেন না জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা কান্নাকাটি করবেন না। শুভকর্মে ওতে অমঙ্গল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন স্থির করে দিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা, যদি ভালো দিন হয়, তা হলে তুমি যা বলেছিলে আসছে রবিবারেই হয়ে যাক। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাকলে বাঁচি।

আশু। অমন কথা বলবেন না, আমার মতের কখনো নড়চড় হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুঁয়ে তো তাই ব'লেও ছিলে, কিন্তু দশ মিনিট না যেতেই এক পানপাত্রের কথা শুনেই তোমার মত বদলে গেল।

আশু। তা বটে। পানপাত্রটা আমি আদবে পছন্দ করি না—

শ্যামা। কেন বলো তো বাবা?

আশু। তা ঠিক বলতে পারছি নে— ওই আমার কেমন— বোধ হয়, ওটা— কী জানেন, পানপাত্রটা যেন— কে জানে ও কথাটাই কেমন— হঠাৎ শুনলে কী যেন—তা, এই বাড়িটার নম্বর কী বলুন দেখি।

শ্যামা। ওঃ, তাই বুঝি ভাবছ? আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্ছি নে বাবা। আমরাই উনপঞ্চাশ নম্বরে ছিলুম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেছি। যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নম্বরে বরঞ্চ একবার খোঁজ করে আসতে পার।

আশু। (স্বগত) উঃ, কী ভুলই করেছি! যা হোক, এখন একটা পরিত্রাণের রাস্তা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে। যা হোক, অন্নদার অদৃষ্ট ভালো। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভুলটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কী বাবা? এত ভাবছ কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসি নি।

আশু। ও কথা বলবেন না, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব, আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করবই— এ আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করে যাচ্ছি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই— পা ছুঁয়ে আরও একবার শপথ করেছিলে—

আশু। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্টদেবতার শপথ করে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা করে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বুঝবার জো নেই। কখনো বা তাড়া দেয়, কখনো বা ঢিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশু। তবে অনুমতি করেন তো এখন আসি।

শ্যামা। তা, এসো বাবা। [প্রণাম করিয়া আশুর প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

অন্নদা

অন্নদা। ব্যাপারখানা তো কিছুই বুঝতে পারলেম না। ঘটকের কথা শুনে এলেম কন্যা দেখতে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে তো বয়স দেখে কোনোমতেই কন্যার মা বলে মনে হয় না, চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী— যদিচ অপ্সরীর চেহারা কিরকম পূর্বে কখনো দেখি নি। শেক্‌হ্যাণ্ড করতে যেমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অমনি ফস করে আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে। আর-কেউ হলে গোলমাল করতেম ; কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল করবার জো কী ! কিন্তু, এ-সমস্ত কোন্‌দেশী দস্তুর তা তো বুঝতে পারছি নে।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান করে তবে পেয়েছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বলো, হুর্‌লিং।

অন্নদা। হুর্‌লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বলো, কুড়বং কড়বং কৃড়াং।

অন্নদা। (স্বগত) ছি ছি ! ভারি হাস্যকর হয়ে উঠছে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্ভুত শব্দগুলো উচ্চারণ !

মাতাজি। চুপ করে রইলে যে ?

অন্নদা। বলছি। কী বলছিলেন বলুন।

মাতাজি। কুড়বং কড়বং কৃড়াং।

অন্নদা। কুড়বং কড়বং কৃড়াং। (স্বগত) রিডিক্লাস !

মাতাজি। মাথাটা নিচু করো। কপালে সিঁদুর দিতে হবে।

অন্নদা। সিঁদুর ! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে ?

মাতাজি। তা জানি নে, কিন্তু ওটা দিতে হবে। [অন্নদার কপালে সিঁদুর-লেপন

অন্নদা। ইস ! সমস্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন !

মাতাজি। বলো, বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ। (অন্নদার অনুরূপ আবৃত্তি) প্রণাম করো। (অন্নদাকর্তৃক তথা কৃত) বলো কুড়বে কড়বে নমঃ। প্রণাম করো। বলে হুর্‌লিঙে ঘুর্‌লিঙে নমঃ। প্রণাম করো।

অন্নদা। (স্বগত) প্রহসনটা ক্রমেই জমে উঠছে।

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধো।

অন্নদা। (স্বগত) এই শালুর টুকরোটা মাথায় বাঁধতে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হতে চলল। (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আমি পাগড়ি পরতেও রাজি আছি, এমন কি বাঙালিবাবুরা যে টুপি পরে তাও পরতে পারি—

মাতাজি। সে-সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই।

অন্নদা। দিন!

মাতাজি। এইবারে এই পিঁড়িটাতে বসুন।

অন্নদা। (স্বগত) মুশকিলে ফেললে। আমি আবার ট্রাউজার পরে এসেছি। যাই হোক, কোনোমতে বসতেই হবে। [উপবেশন

মাতাজি। চোখ বোজো। বলো, খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিচ্ছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পুবমুখো হয়ে বোসো, ডান কানে হাত দাও। বলো খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পিছন ফিরে বোসো। দুই কানে দুই হাত দাও। বলো খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কী দেখতে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলুন।

মাতাজি। একটা গর্দভ দেখতে পাচ্ছ তো?

অন্নদা। পাচ্ছি বৈকি! অত্যন্ত নিকটেই দেখতে পাচ্ছি।

মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেছে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ, তার পিঠের উপরে একজনকে দেখতে পাচ্ছি বৈকি।

মাতাজি। গর্দভের দুই কান হাতে চেপে ধরে—

অন্নদা। ঠিক বলেছেন, কষে চেপে ধরেছে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেছেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, কোন্ কোণে যাচ্ছেন তা ঠিক বলতে পারছি নে। কিন্তু ছুটিয়ে চলেছেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে গেল!

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্ছেন না কি? তবে তো আর-একবার—

অন্নদা। না না, ছুটিয়ে যাবেন কেন— কিরকম যাওয়াটা আপনি স্থির করছেন বলুন দেখি।

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার পিছু হটে পিছিয়ে আসছেন।

অন্নদা। ঠিক তাই। এগোচ্ছেন আর পিছোচ্ছেন। গাধাটার জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

মাতাজি। তা হলে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হল। ওলো মাতঙ্গিনী, তোরা সবাই আয়।

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ

অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন

অন্নদা। এটা বেশ লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি নে।

রমণীগণের গান

এবার সখী, সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা।
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা।
দয়ামায়া করিস নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না যে
একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধি-বিচার-হরা॥

অন্নদা। বুদ্ধি বিচার একেবারেই যায় নি! অতি সামান্যই বাকি আছে। তার

থেকে মনে হচ্ছে, ওই-যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হল সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না। গানটি ভালো, সুরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না, কিন্তু রূপক ভেঙে সাদা ভাষায় একটু স্পষ্ট করে সবটা খুলে বলুন দেখি— আমার সম্বন্ধে আপনারা কী করতে চান? পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ-সকল গুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হয়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর?

অন্নদা। করে লাভ কী, কেবল সময় নষ্ট। তাঁকে স্মরণ করে যেটুকু সুখ আপনাদের দর্শন করে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ।

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ করে সময় নষ্ট করেন?

অন্নদা। তা হলে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না; হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন নয় দর্শন দিন— সময়টা মূল্যবান জিনিস।

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে! মনে যেরকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হলে গলায় দড়ি দিতে হত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ-সমস্ত ব্যাপার কেন?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণ-মন্ত্র শিখেছিলেম আগে সেইটে প্রয়োগ করে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর-কারও উপর এ মন্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ করে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করছি। অব্যর্থ মন্ত্র। মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হল না?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে একবার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

[দাসীকর্তৃক সম্মুখে আহার্য-স্থাপন

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্যমৃগই হোক আর শহুরে গাধাই হোক পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারি। [আহারে প্রবৃত্ত

আশুর দ্রুত প্রবেশ।

[মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান

আশু। ওহে অন্নদা, ভারী গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ! তোমার এ কী রকমের সাজ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কী? নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা! তোমার বলিদান হবে না কি?

অন্নদা। হয়ে গেছে।

আশু। হয়ে গেছে কী রকম?

অন্নদা। সে-সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার খবরটা আগে বলো।

আশু। তুমি বিবাহের জন্য যে কন্যাটিকে দেখবে বলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে করে বরাবর এমন নির্বোধের মতো কথাবার্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন, আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে তো আর উদ্ধার নেই।

অন্নদা। মেয়েটি দেখতে কেমন?

আশু। দেবকন্যার মতো।

অন্নদা। তা হোক, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কী! সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভালো যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয়?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কিরকম দেখা যাক।

অন্নদা। তবে একটু বোসো। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশু। অ্যাঁ! ইনি তোমার— আপনি আমাদের অন্নদার— কী আশ্চর্য! তা হলে তো হতে পারে না।

অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ? হয়েছে, আবার হতে পারে না কী? এক-বার হয়েছে, এই আবার দুবার হল, তুমি বলছ হতে পারে না!

আশু। না, আমি তা বলছি নে। আমি বলছি, সেই বাইশ নম্বরের কী করা যায়!

অন্নদা। সে আর শক্ত কী! সহজ উপায় আছে।

আশু। কী বলো দেখি।

অন্নদা। বিয়ে করে ফেলো।

আশু। সমস্ত বিসর্জন দেব— আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

অন্নদা। ভয় কী, তুমি যেগুলো ছাড়বে আমি সেগুলো গ্রহণ করব। সে যাই হোক, তোমার বশীকরণটা কিরকম হল?

আশু। তা, নিতান্ত কম হয় নি। তোমার এই একটা ঠাট্টা করবার বিষয় হল।

অন্নদা। আর ঠাট্টা চলবে না।

আশু। কেন বলো দেখি।

অন্নদা। আমারও বশীকরণ হয়ে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা করে আসি গে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮

শারদোৎসব

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী
ঠাকুরদাদা
লক্ষেশ্বর
উপনন্দ
রাজা
রাজদূত
অমাত্য
বালকগণ

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

শারদোৎসব

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি!
কেয়া-পাতায় নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল-দিঘিতে ভাসিয়ে দেব—
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরিধারীলাল! ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো ; একটাকেও ছাড়িস নে।

একজন বালক। (চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)—

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখব না!

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা ? মারমূর্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর। আরে, দেখো-না ! সকালবেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি আর সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়।— ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।— যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না, গল্প না, বটতলায় ব'সে আজ ঠাকুর্দার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুর্দা, আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ! অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে!

[কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে, তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন? আমার টাকাগুলোর কী হবে?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র! কী শুভসংবাদটাই দিলে!

উপনন্দ। আমি শুভসংবাদ দিতে আসি নি। আমি এক দিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহু দুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহু দুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ! আমি তত বড়ো গর্দভ নই।— আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি।

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-এক জনের ওইরকম মরাই স্বভাব!— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে? আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না! তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে! টাকাটা ঠিকমতো দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ওই যে! আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।— ধনপতি, এখানে কেন রে? তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ওই রে, খবর পেয়েছে বুঝি! বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে! এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি! যা বলছি ঘরে যা। [ধনপতির প্রস্থান

ভারী বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্‌দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগুলো খবর পায় নি তো! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব! সব জিনিস খুঁড়ে বের করে ফেলে— কোনো জিনিসের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক। ঠাকুর্দা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুর্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।—

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা!

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুর্দা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন! তোমার সঙ্গে আড়ি! জন্মের মতো আড়ি!

ঠাকুরদাদা। এতবড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুর্দা, ওই দেখো, ওই দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ!

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

ঠাকুরদাদা। আরে, থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই, আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন!

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ! আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ!

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন! এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কত দিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই— এলেন ব'লে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে!

বালকগণ। উপনন্দ!

প্রথম বালক ভাই উপনন্দ, এসো ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার-চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারী তো কাজ!— ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না! ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন। কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী— সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর, এমন দিনেও ঋণশোধ!— ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলিবন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ওই ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে— চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ! তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না!

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারী কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল বাবা-সকল? আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক। দাও দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও!

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না!

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব! কেন পারব না!

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে! আচ্ছা, তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুর্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো-বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদা।— গান

সিন্ধু ভৈরবী। তেওরা

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্‌ রে সবাই, টান্‌ রে সবাই টান্‌।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে ?—
পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা !

ঠাকুরদাদা। (জিভ কাটিয়া) প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে ?

সন্ন্যাসী। তুমি যে জগতে ঠাকুর্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না! ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে ?

ঠাকুরদাদা। ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ— তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা, কী আজ্ঞা কর !

সন্ন্যাসী। আমি বলছিলেম ওই-যে গানটা গাইলে, ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ওই অত্যন্ত টানাটানির কথাটা, ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না— টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা। তোমাদের সঙ্গ এইজন্যই এত দামি ; ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল।

সন্ন্যাসী।— গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল ?

উপনন্দ। স্বরসেন।

সন্ন্যাসী। স্বরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে ?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম!

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল ?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এতবড়ো গুণী ? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি ?

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে ?

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না, বিজয়াদিত্য ব'লে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই ব'লে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা, সেই লোকটির সভায় একদিন স্বরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এতবড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী। আদর কর নি তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরো তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।— বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল ?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন; লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন ক'রে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র ক'রে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো, লেখো।

ছেলেরা। ওই রে, ওই আসছে! ওই রে লখা, ওই রে লক্ষ্মীপেঁচা! [দৌড়

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে! তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।— উপনন্দ!

উপনন্দ। কী?

লক্ষেশ্বর। ওঠ্, ওঠ্ ওই জায়গা থেকে! এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু? ভারী সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা। আরে, কী বলিস লখা, আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না! টাকা হয়েছে ব'লে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

[সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুকায়ন

সন্ন্যাসী। আরে, কর কী ঠাকুরদাদা! কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ওই বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি।—ঠাকুর্দা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম ব'লে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুর্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র!

উপনন্দ। আচ্ছা, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী! এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো! এখন কী করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই-যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো— এই হয়েছে! খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে, লখা করে কী! হঠাৎ খেপে গেল নাকি!

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি— শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্ দিন আমার ভিটে-বাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারি নে। [প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি এক বার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই, ওইখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন—

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল— আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক, আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে! আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ড তপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে, সে ফাঁকিতে আমার কী হবে! আমাকে একটা-কিছু ভালোরকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধু-হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই?

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না! শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে; এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে; আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়! তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ! কোনো গতিকে পদ্মটি যদি যোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন! এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসীমানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দু কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তলপি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে; কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব!— ওই রে, রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দৃপ্ত তরবারী,
সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী—
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। জয় হোক! কী বাসনা তোমার?

রাজা। সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্‌, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

রাজা। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নয়।

রাজা। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী-সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা। কিন্তু, বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকালবেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে?

রাজা। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারী খুশি হব।

রাজা। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা! আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত

করে বলেছ এতে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না

রাজা। তবে বিদায় হই। প্রণাম! [প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য ক'রে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা ব'লে মনে করে— কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা-কিছু ব'লে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা। তাই দিয়ো, ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী। তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থেরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়টা আছে যে, ওই ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে— কোন্‌দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা। প্রণাম! [প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না!

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা?

উপনন্দ। মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে! সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনো মতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে, আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক ব'লে, ছোটো জাত ব'লে, সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য ব'লে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা, হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনা মূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব? তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর-কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি; নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তোমাকে দেখে আমিও যে কত বললাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ। তা আনছি। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় ক'রে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম; আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হাল্কা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই, তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া)— না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে

এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্‌ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ওই এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে। হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ওই মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে! কিন্তু, আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ওই সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু, তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম! [প্রস্থান

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি— সেটি তোমাকে খুলে না ব'লে থাকতে পারছি নে।

ঠাকুরদাদা। আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া।

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে। সেই-জন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ওই উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। তোমরা চুপিচুপি দুটিতে কী পরামর্শ করছ?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু, এসব কি ঠাকুর্দার কর্ম? ওঁর পুঁজিই বা কী?

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু, একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুর্দা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না— তা হলে এত দিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকর-বাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে-তেওয়ারি-গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে?

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু, ব'লে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ওই। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁসি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই? যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুর্দাকে

নিয়ে অতবড়ো কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুর্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।— ওই-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ওই দেখছ না দূরে? আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না। কিন্তু ঠাকুর্দা, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্র-ধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ওই-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল ব'লে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। না বাবা, আমি পারব না! ভালো বুঝতে পারছি নে। ও-সব আমার কাজ নেই— আমার যা আছে সেই ভালো। কিন্তু, তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ! তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই! তুমি ঠাকুর্দাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম। [দ্রুত প্রস্থান

ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা!

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা? আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও।

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। তবে এক কাজ করো। ওই কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভ'রে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ওইখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক। কী করতে হবে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে— আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

[কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই?

বালকগণ। এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে? আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। দেখো-না, আবার গেরুয়া পরেছে!

সন্ন্যাসী। জটাও ফেলব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী। যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড নাকি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না— ছেলেটা ম'ল বটে, কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী? আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু-বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও, তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে। ভাগ্যে যদি থাকে, তবে তো দর্শন পাব। তা, চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। (বালকদের প্রতি) বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব ব'লেই তো উৎসব।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। ওই বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে।

ঠাকুরদাদা। তবে চলো সবাই। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। গান

রামকেলি। কাওয়ালি

নবকুন্দধবলদল-সুশীতলা

অতিসুনির্মলা সুখসমুজ্জ্বলা

শুভ-সুবর্ণ-আসনে-অচঞ্চলা!

স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী

পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী

নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা!

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি! কী মুশকিলেই ফেলেছ! আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল! একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুর্দা! কিন্তু, এ তো ভালো কথা নয়! চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার। কিন্তু, সে হবে না, কোনোমতেই হবে না! চুপ করে হাসছ কী? আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না। [প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।

আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।

কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।

অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।

এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি। একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি

পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

সন্ন্যাসী। পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে— সেই অনেক অনেক দূরে! সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

ভৈরবী। একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!
পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন—

ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া!

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী। ওই-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী। ওই-যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গাও, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদা।

গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী। যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

[ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে!

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো; এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কোরো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী। বোসো বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ ! একটু বিশ্রাম করো।

রাজা। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে !

সন্ন্যাসী। বল কী ! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি, তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা। কী সর্বনাশ ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন !

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন ? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্‌যোগে ছিলে।

রাজা। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা, সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি! তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা! আমি কি এমনি উন্মত্ত! আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী! আমার শক্তিই বা এমন কী আছে !

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা !

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু ?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম, আর ওই চক্রবর্তী-সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে! লোকটা কিরকম দুর্ভাগা দেখেছ !

রাজা। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে !

সন্ন্যাসী। ওই বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা। আরে চুপ, চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা। কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর! সে এখন থাক্-না— ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে? একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য! [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা। আরে, করেন কী! করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে?

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য ব'লেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা। (জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান?

সন্ন্যাসী। বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে-কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা। আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী। তার মধ্যে একটা তো উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সম্মান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব— তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা। (নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী। তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট ব'লে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্যের ত্রুটি। সেরকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে-সমস্তই স্বহস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী। উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা। উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব ব'লে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর। আমাকেও ঠাকুর— না না, মহারাজ, ওই-রকম একটা কী উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী। উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

লক্ষেশ্বর। আজ্ঞা না।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! একি, রাজা যে! এরা সব কারা! [পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো, এসো, বাবা, এসো কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম, এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা?

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি ব'লেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারী লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী! তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী। ওগো স্বভূতি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই ব'লে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা, ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ-ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ?

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি; এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

রাজা। কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না। তবে কিনা, ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায় তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি?

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ওই আসছে।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।

সকলে। এ কী! এ যে রাজা! আরে, পালা, পালা! [পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে, পালাস নে, পালাস নে।

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা। যে আদেশ। [প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

ঠাকুরদাদা। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে!
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ—
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী !
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !

৭ ভাদ্র ১৩১৫

উপন্যাস ও গল্প

চতুরঙ্গ

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ।
'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও
'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।

চতুরঙ্গ

জ্যাঠামশায়

১

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি এ ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরও তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারী অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছটফট করিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না। শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি!— আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা। তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা কোনো দামি কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই। আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর— জাতি-হিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমনকি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার-বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে! ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা। এইজন্য মিলটন-শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন: মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা, আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল; সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

২

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই
অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই

অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্‌থস পড়িয়াছিলেন; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উল্টা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই, সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনি বিপরীত— এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এই ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবাযত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন; থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন— গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উন্টা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ওই ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা, জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্নার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্‌ করিত। তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে

ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার ; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন : মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা ; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না ; তার পরে, ওই অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি ; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয় -সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয় ; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

৩

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে ; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন ; দাদার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না ; মুর্গি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইঁহারা এত দূর গিয়াছিলেন যে মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের

পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্‌শিশের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী' তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উল্টা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেষকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর!

হাঁ, আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল, আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না। শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

৪

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট, এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি দেবদেবী মানেন না; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিঁকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাক-ঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে? জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই. শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল.।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার

কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই-যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্‌কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুডবাই শচীশ!

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল— তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিস-পত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারম্বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্র-ঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৫

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কী ?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর-দুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে ; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর ! কিন্তু, বইগুলো ?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, এসো, আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া !

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না ; তাঁর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে

সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল!

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না। আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি।— বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ-ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উল্টাপাল্টা; আর আমার কথা যদি বল, কখন নাই, কখন খাই, তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই, এমনকি মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া!

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না, সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না; সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না, এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল, ননি জগমোহনের মেয়ে; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা,

আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, এ কী কাণ্ড জগাই! পাপ বিদায় করিয়া দে।

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?

কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব? হরিমোহনের এ কেমন কথা!

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে!

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালের ও পাশেই বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে, ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া!

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান। জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল

রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল ; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তাই বটে ! তুই এখানে !

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিম্বা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, ননি !

এমন সময় জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, বেরো ! আমার ঘর থেকে বেরো !

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে ; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত, কলিকাতা শহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারৎপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল, একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর এক প্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে, ইহা তাঁর কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁষিল না।

ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্ট্‌মাসের ছুটি। জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, 'আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।'

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন।

অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী, দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা শহরে চলিয়া যাই; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে। আমি ননিকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইন-মতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

৬

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি?

জগমোহন কহিলেন, সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো— তার সঙ্গে ওই পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?

শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি— আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, এ কী শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ওই মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীর মতো! এমন কথা মুখে উচ্চারণক রিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, মা, আমার মনের মতো করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব— এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো। এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন; ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে; তিনি যে কাপড়-গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন:

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিযাছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

—পাপিষ্ঠা ননিবালা

শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তকমা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেই সঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?

কাদের?

ওই-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তার মেসে গিয়া বলিলেন, চল্।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো—

'আজ্ঞা হাঁ' বৈ কি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী: আমাদের দলে এক জন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম— কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরও জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন -সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন: সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই— সে যে আবর্জনা।—

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্‌-এক জায়গায় শচীশ— আমাদের শচীশ— লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দ স্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে! শত্রুও তো এক-আধ জন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

৪

গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনই লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন— থাক্, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম; সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো হে শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের

মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না— কিন্তু কী জানি— সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামী জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই— মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যাসমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উল্টাইয়া দিয়া শচীশ কিছু বা স্নেহের কৌতুকে কিছু বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠা-মশায়ের ছিল না— মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন ; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে আমি শ্রীবিলাস নয়, সে আমি 'সর্বভূত' ; সে আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো ; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্‌, আমার তো নাই ; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না— আমি যে আমি।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না ; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল ; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব।

৫

আমাদের মতো এতবড়ো তুখোড় দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দ স্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন ; সমস্ত দলবল সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই— কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম— চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্‌টিয়ারি করিয়াছি, পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব; এই-খানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি; ক্ষুধাতৃষ্ণা-সুখদুঃখ-ভালো-মন্দের-বিচিত্র-সমস্যায়-পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-এক বার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চস্বরের ডাক—'বামী'। আমরা ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক তো ওইখানেই— যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি— সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি— অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনফার হঠাৎ-প্লাবনে উপচিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে

কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গনৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্‌-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্‌-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দ-স্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উল্টা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এই জন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্দুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেই জন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে

নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে— তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিয়াছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। এক দিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরও বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন এক দিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ্য হইয়া আছে— ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েক দিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না— লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়— তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরও এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্ করিতে থাকিত। এক-এক বার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না— ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব ; সেই-যে চামারদের ছেলে-গুলাকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি বছরে এক বার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন? সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল, সম্বৎসর ইহার জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন— আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে—

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন—

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও— তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল— অনেক ক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে— সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনো-মতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্ ঝপ্ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে

অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম— সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি ; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানি না কতক্ষণ পরে— সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়— অসাড়তার একটা পাৎলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে— এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে— সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্য-বাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপ্‌চিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরও জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদিগকে এ দিক ও দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর আমি— আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বলো দেখি।

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে? কেন?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে তো অবাক। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ওই একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ওই কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুম্‌ঝুমির মতো বারবার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে, তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল— আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে

নালিশ করিতে থাকে ; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন ?

কোন্‌খানে ?

গুরুজির কাছে।

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন ?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না !

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে ? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায় ? জোড়হাত করি তোমাদের রক্ষা করো আমাকে— আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে ; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি— নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ, এটুকু জানে যে, তারা

কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয় আবার সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না; তারা যা, আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি— এইজন্য তারা যদি বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু— যাক, এ-সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত— অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল কী হইল সেই-সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে— পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম, শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে— সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশ-পাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার

আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালাবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমনকি বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইজন্য রাখিয়া আত্মমর্যাদা-উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না; বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, একবার—

দামিনী বলিল, উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।

শচীশের সামনে দামিনীর এই প্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে— কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল— সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিন জনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত— আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ্য সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায়

ওই রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া ?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেই জন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমতো গড়িতে চাও ? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

এক দিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেক দিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন, এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি-সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই

ফস্ করিয়া উঠিয়া আসিলাম ; আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনও নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন উস্‌খুস্ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্ করিয়া জ্বলিল ; সে কহিল, কেন আছি! আমি কি সাধ করিয়া আছি! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী ?

তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন— মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি ?

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণহাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর, দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরও বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে, হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো। শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের

দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিক ক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারী একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়— কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব ?

তোমার মাসির ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন ?

প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন ; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন ?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—

দায় কি কেবল খরচের ? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্ত ক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব ?

সে জবাব কি আমার দিবার ?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে ?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই ; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই। সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি ; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন ; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন !

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে এক রকম

করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো— দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুইচারিটি পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা, তবে এক বার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বারবার আসে আর যায়, মনে করে 'বসিয়া পড়ি', অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারী একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেইখানে গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম, শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উল্টাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু, কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী! দামিনী!

দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কী চেহারা! প্রচণ্ড-

ঝড়ের-ঝাপ্‌টা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম— আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কী কথা আপনি বলিতেছেন?

না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামতো ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি।

শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না। এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল, এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো এক দিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না, কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস

করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন, তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলা ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেক বার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-এক বার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। আমার যে কয়েকটি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুরছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

৬

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কী হইয়াছে ?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়— আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কালেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এই রকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল— তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিনে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী!

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো

আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে? প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিন জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বলো আমি তোমার কী করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস— যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীবিলাস

১

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়াচুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে সিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্‌-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা— বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে— যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরও এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে— কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী— কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই— গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ', এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়— সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দস্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম একজিকুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, এক দিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-এক দিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই-যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল হুল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনই না'ই গেলাম। নদীর ধারে ওই যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে এক বার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট্ স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে— স্পষ্ট দেখিতেছি

শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে এক রকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার এক জন কোনো গুরুর দরকার যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো— সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন— গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উল্টা কথাই শোনা গেল। আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দু দিন না যাইতেই সেই আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্— চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত— যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দস্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মতো নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদীপার হইয়া ও পারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির

পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারী গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন ?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি তুমি আর-একটু পরে—

শচীশ বলিলা উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি এক পাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন ?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি না আমি তার কিছু করিতে পারি ?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেইজন্যই বড়ো দুঃখে কিম্বা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যে রকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত— ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি।

তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর্।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমতো স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্‌দুর্ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না— কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌জ্বল্-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী ?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে ; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না ? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-এক জন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব— চিরকাল ধরিয়া ! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন!

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়্‌মুড়্‌ হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কেও!

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্‌গর্‌ করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেক ক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়্‌পড়্‌ শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চীৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটু ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারী রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারী একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুর্‌মার্‌ হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে —বলিয়া দামিনী বুকে দম্‌ দম্‌ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে টীটি পড়িয়া

গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ওইটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয় 'এখানে জায়গা নাই'। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দস্বামীর কাছে।

লীলানন্দস্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দস্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক— কিন্তু—

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা? কাকে তুমি বল বাজে কথা?

এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না; অন্তত, তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এত দিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমনকি, তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরও খানিক ক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল— অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি।

সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল-ক'টার মধ্যে বারবার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ওই বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারী শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ওই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য-সাধন নয়, এ যে অসাধ্যসাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ্। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারও চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ— ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিতু মানুষ। সে হয়তো এত ক্ষণে নদীর ও পারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারও নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনও যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে

যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরও ধুম হইল কাগজে! পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকদের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো'সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ওই শচীশ।

শচীশ তো বলিল 'আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো', কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না— ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা— কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এপর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুই জনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে একজামিন-পাশের পেটেণ্ট্ ঔষধ বাহির করিলাম— পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু, দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-

একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না— চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার— স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়েবামুন বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব-ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উল্টা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরও একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও— সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

প্রবন্ধ

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক

রসিকতার ফলাফল

আর কিছুই নয়, মাসিক পত্রে একটা ভারী মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পড়িয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তো হাসিয়াছিলই, আবার শত্রুপক্ষও খুব হাসিতেছে।

অষ্টপাইকা, সাপ্‌টিবারি ও টাঙ্গাইল হইতে তিন জন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রবন্ধটির অর্থ কী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রতা করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহাতে ছাপাখানার গলদ আছে; আর-এক জন অনাবশ্যক সহৃদয়তাবশত লেখকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন; তৃতীয় ব্যক্তি অনুমান এবং আশঙ্কার অতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ, বস্তুত আমিই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—

'গোবিন্দবাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কী? ইহাতে কি ফরাসডাঙার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? দেশে যে এত লোককে খেপা কুকুর কামড়াইতেছে এ প্রবন্ধে কি তাহার কোনো প্রতিকার কল্পিত হইয়াছে?'

'অজ্ঞানতিমিরনিবারণী' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে—

'গোবিন্দবাবু যদি সত্যই মনে করেন দেশে ধানের খেতে পাটের আবাদ হইয়া চাষাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে তাঁহার প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আর যদি তিনি বলিতে চান পাট ছাড়িয়া ধানের চাষই শ্রেয় তবে সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু কোন্‌টা যে তাঁহার মত, প্রবন্ধ হইতে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।'

দুরূহ সন্দেহ নাই। কারণ, পাটের চাষ সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথাই বলি নাই।

'জ্ঞানপ্রকাশ' বলিতেছেন—

'লেখার ভাবে আভাসে বোধ হয় বালবিধবার দুঃখে লেখক আমাদের কাঁদাইবার চেষ্টা করিয়াছেন— কাঁদা দূরে যাক, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।'

হাস্যসম্বরণ করিতে না পারার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আভাসে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিজগুণে।

'সম্মার্জনী'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন—

'হরিহরপুরের ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে গোবিন্দবাবুর যে সুগভীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে দুঃখিত ও আশ্চর্য হইলাম, ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন, জন্মিলেই মরিতে হয়— এই চমৎকার ভাবটি যদি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম। নিম্নে আমরা কয়েকটি চোরাই মালের নমুনা দিতেছি— গিবন বলিয়াছেন, রাজ্যে রাজা না থাকিলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ঘটে; গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, একে অরাজকতা তাহাতে অনাবৃষ্টি, গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। সংস্কৃত শ্লোকটিও কালিদাস হইতে চুরি। রাস্কিনে একটি বর্ণনা আছে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধনবাবুর টাকের উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। কী আশ্চর্য চুরি! কী অদ্ভুত প্রতারণা!! কী অপূর্ব দুঃসাহসিকতা!!!'

'সংবাদসার' বলেন—

'রামধনবাবু যে নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণবাবুর টাক নাই বটে, কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়।'

আমার নিজেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। আমার প্রবন্ধ যে হরিহরপুর ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে লিখিত তৎসম্বন্ধে 'সম্মার্জনী'র যুক্তি একেবারে অকাট্য। হরিহরপুর চব্বিশ-পরগনায় না তিব্বতে না হাঁসখালি সবডিবিজনের অন্তর্গত আমি কিছুই অবগত নহি; সেখানে যে ম্যুনিসিপালিটি আছে বা ছিল বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর।

অপর পক্ষে, আমার প্রবন্ধে আমি নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা কঠিন। 'সংবাদসার' এমনি নিবিড়ভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে ছুঁচ চালাইবার জো নাই। আমি একজনকে চিনি বটে, কিন্তু সে বেচারা ত্রিবেদী নয়, মজুমদার; তার বাড়ি নেউগিপাড়ায় নয়, ঝিনিদহে; আর তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় টাক থাকা চুলায় যাক, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই নাই, দুইটি ভাগিনেয় আছে বটে।

যাঁহারা বলেন আমি বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনির মালেকদের চরিত্রের

ক্যালিমার সহিত উক্ত কয়লার তুলনা করিয়াছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত খনি আছে কি না এবং কোথায় আছে এবং থাকিলেই বা কী, যদি খোলসা করিয়া সমস্ত আমাকে লিখিয়া পাঠান তবে খনিরহস্য সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়। যিনি যাহাই বলুন 'লুনের ট্যাক্স' 'বিধবাবিবাহ' কিম্বা 'গাওয়া ঘি' সম্বন্ধে যে আমি কিছুই বলি নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

এ দিকে ঘরেও গোল বাধিয়াছে। গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়স্বরূপ আমি এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম, এ জগৎটা পশুশালা। আমার ধারণা ছিল যে পাঠকেরা হাসিবে। অন্তত তিন জন পাঠক যে হাসেন নাই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। প্রথমত শ্যালক আসিয়া আমাকে গাল পাড়িল ; সে কহিল, নিশ্চয়ই আমি তাহাকেই পশু বলিয়াছি। আমি কহিলাম, বলিলে অপরাধ হয় না, কিন্তু তোমার দিব্য, বলি নাই। ভ্রাতার অপমানে ব্রাহ্মণী পিতার ঘরে যাইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। জমিদার পশুপতিবাবু থাকিয়া থাকিয়া রাগে তাঁহার গোঁফজোড়া বিড়ালের ন্যায় ফুলাইয়া তুলিতেছেন। তিনি বলেন তাঁহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া অনধিকারচর্চা করিয়াছি, এবং লোকসমাজে তিনি আমার সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা সুশ্রাব্য নয়। এ দিকে পাকড়াশি-বাড়ির জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অট্টহাস্যের সঙ্গে মুখভ্রষ্ট চায়ের ও রুটির কণায় বজ্রবিদ্যুদ্‌বৃষ্টির কৃত্রিম দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে যেমনি পড়িলেন 'জগৎটা পশুশালা' অমনি হাস্যের বেগ হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলায় চা বাধিয়া গেল— লোকে ভাবিল, ডাক্তার ডাকিবার সবুর সাহিবে না।

পাড়াসুদ্ধ লোকের ধারণা যে, আমার প্রবন্ধে আমি তাহাদেরই পরমপূজনীয় জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর অথবা ভাগ্নীজামাই সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো সত্য কথার আভাস দিয়াছি ; তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথার খুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে এমন কথা প্রকাশ করিতেছে। আমার প্রবন্ধের গভীর অভিপ্রায়টি যে কী তৎসম্বন্ধে আমার কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের অভিপ্রায় যে কী তৎসম্বন্ধে তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু আমার পক্ষে নাই। বস্তুত তাহাদের ভাষা উত্তরোত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মনে করিয়াছি বাসা বদলাইতে হইবে, আমার রচনার ভাষাও বদলানো আবশ্যক। আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।

১২৯২

ডেঞ্চো পিঁপড়ের মন্তব্য

দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে— ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞ্চো, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ওই পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।

হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হ'ত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে— একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাত! সত্যি বলছি, আমার দেখতে ভারী মজা লাগে।

আমার পা দেখো আর ওদের পা দেখো! যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে, এতবড়ো পা! পদমর্যাদা এর চেয়ে আর কী আশা করা যেতে পারে! কিন্তু পিঁপড়েরা আপনাদের খুদে খুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। হাজার হোক, পিঁপড়ে কিনা।

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি— ওদের সবটা আমার নজরে আসে না। কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃক্‌পাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ, পিঁপড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের দেখে ফেলতে অধিক ক্ষণ লাগে না। পিঁপড়ে-জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখব এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপড়ে-সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে। ডেঞ্চোদের সন্তানস্নেহ আছে, অতএব পিঁপড়েদের তা কখনোই থাকতে পারে না; কারণ, তারা পিঁপড়ে, কেবলমাত্র পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায় পিঁপড়েরা মাটিতে বাসা বানাতে পারে; স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তারা ডেঞ্চো জাতির কাছ থেকে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করেছে— কারণ, তারা পিঁপড়ে, সামান্য পিঁপড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা।

পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমনকি আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞ্চো-সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্চো-ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কারকার্যে ব্রতী হই— এতদূর পর্যন্ত ত্যাগস্বীকার

করতে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোনোক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছুমাত্র উন্নত হয়।

তারা উন্নতি চায় না— তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্চে তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব— আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে, তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেঞ্চে! দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থভাবে পিঁপড়েদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয়, আমাদের প্রিয় ডাঁইভূমি ত্যাগ করে আসতে হবে, সেইজন্য, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য, শর্করা কিছু অধিক পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে— তা হলে বোধ করি আমরা বেশি দিন বাঁচব না— হায়, আমাদের কী শোচনীয় অবস্থা! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব।

পিঁপড়েরা যদি আপত্তি করে তবে তাদের বলব, অকৃতজ্ঞ! যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে স্থান পেতে চায় তবে ডাঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বলব, তোমরা পিঁপড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কী আছে!

তবে পিঁপড়েরা খাবে কী? তা জানি নে। হয়তো আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘ-পদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এমনি একটা বন্দোবস্ত থাকলে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কী?— মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চলতে হয়।

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিঁপড়ে জাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব— কারণ, আমরা ডেঞ্চে জাতি, উচ্চপদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।

চৈত্র ১২৯২

প্রত্নতত্ত্ব

১

প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারেই এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ছিল না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা, আধুনিক ভারতে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিতান্ত অভাব। বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকেরা দেখিবেন, আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই এবং তাহাতে যথেষ্ট ফললাভও হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার পূর্বে কীট্টকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের জীবিতকাল নির্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমত, কীট্টকভট্ট কোন্‌ রাজার রাজত্বকালে বাস করিতেন সেইটি নিঃসংশয়রূপে স্থির করা যাউক। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি পুরন্দরসেনের মন্ত্রী, অন্য মতে তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেখিতে হইবে পুরন্দরসেন কয় জন ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কে মিথিলায়, কে উৎকলে এবং কেই বা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহার রাজত্বকাল খৃস্ট-শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, কাহার নয় শত বৎসর পরে এবং কাহারই বা খৃস্ট-শতাব্দীর সমসাময়িক কালে। বোধনাচার্য তাঁহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পরম্পারম্প্রথিতপথিকৌ (মধ্যে পুঁথির দুই পাতা পাওয়া যায় নাই) লসত্যসৌ। এই শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বকোবিদ্‌ পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইতেছে না।

কারণ, নৃপতিনির্ঘণ্ট গ্রন্থে উতঙ্কসূরি লিখিতেছেন— নিগ···নন্দ···পরন্ত···ঙ্গং। ইহার মধ্যে যেটুকু অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই কীটে নিঃশেষপূর্বক পরিপাক করিয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বোধনাচার্যের লেখনের কোনো সমর্থন করিতেছে না ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু উভয়ের লেখার প্রামাণিকতা তুলনা করিতে গেলে, বোধনাচার্য ও উতঙ্কসূরির জন্মকালের পূর্বাপরতা স্থির করিতে হয়।

দেখা যাউক, চীন-পরিব্রাজক নিন্‌ফু বোধনাচার্য সম্বন্ধে কী বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বলেন না।

আমরা আরব-ভ্রমণকারী আল্‌করীম, পর্‌টুগীজ ভ্রমণকারী গঞ্জলিস ও গ্রীক দার্শনিক ম্যাক্‌ডীমসের সমস্ত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলাম। প্রথমত ইঁহাদের তিন জনের ভ্রমণকাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। আমরাও তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রবন্ধ-সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৎপূর্বে বলা আবশ্যক যে, উক্ত তিন ভ্রমণকারীর কোনো -রচনায় বোধনাচার্য অথবা উতঙ্কস্থরির কোনো উল্লেখ নাই। নিন্‌ফুর গ্রন্থে হ্লাও-কো -নামক এক ব্যক্তির নির্দেশ আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই হ্লাও-কো নাম বোধনাচার্য নামের চৈনিক অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু হ্লাও-কো বোধনাচার্যও হইতে পারে, শম্বরদত্ত হইতেও আটক নাই।

অতএব পুরন্দরসেন একজন ছিলেন কি অনেক জন ছিলেন কি ছিলেন না, প্রথমত তাহার কোনো প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত, উক্ত সংশয়াপন্ন পুরন্দরসেনের সহিত কীট্টকভট্ট অথবা পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের কোনো যোগ ছিল কি না ছিল, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নহে।

অতএব, উক্ত কীট্টকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের রচিত মোহান্তক ও জ্ঞানাঞ্জন -নামক গ্রন্থে যদি গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন বাষ্পের কোনো উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয় বলা শক্ত। শুদ্ধ এই পর্যন্ত বলা যায় যে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সময়ে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সে সময়টা কী তাহা আমি অনুমান করিলে মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিবাদ করিবেন এবং তিনি অনুমান করিলে আমি প্রতিবাদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, কীট্টক ও পুণ্ড্রবর্ধনের নিকট এইখানে বিদায় লইতে হইল। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইল, এজন্য পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রথমত নন্দ উপনন্দ আনন্দ ব্যোমপাল ক্ষেমপাল অনঙ্গপাল প্রভৃতি আঠারো জন নৃপতির কাল ও বংশাবলী -নির্ণয় সম্বন্ধে মধুসূদন শাস্ত্রীর মত খণ্ডন করিয়া সোমদেব চৌলুকভট্ট শঙ্কর কৃপানন্দ উপমন্যু প্রভৃতি পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্ধারণ করিতে হইবে; তাহার পর তাঁহাদের রচিত বোধপ্রদীপ আনন্দসরিৎ মুগ্ধচৈতন্যলহরী প্রভৃতি পঞ্চান্নখানি গ্রন্থের জীর্ণাবশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব, উহাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থেই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি অথবা অক্সিজেনের নামগন্ধ নাই। উক্ত গ্রন্থসমূহে ষট্‌চক্রভেদ সর্পদংশনমন্ত্র রক্ষা-বীজ আছে এবং একজন পণ্ডিত এমনও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের

লাঙ্গুল দর্শন করিলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ও কুণ্ডপতনক-নামক চাতুর্মাস্য ব্রত-পালন আবশ্যক; কিন্তু ব্যাটারি ও বাষ্প বিষয়ে কোনো বর্ণনা বা বিধান পাওয়া গেল না। আমরা ক্রমশ ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া ইতিহাসহীনতা সম্বন্ধে ভারতের দুর্নাম দূর করিব; প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে, পুরাকালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ভারতখণ্ডে ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্সিজেন বাষ্পের কোনো নাম পাওয়া যায় না।

২

মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় কর্তৃক উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন; অতএব প্রাচীন ভারত, সাবধান! কোথায় খোঁচা লাগে কী জানি। অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন! অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যতলেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলার দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা!

আমাদের দেশে যে এক কালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ভাই বাঙালি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? তাহা হইলে তোমার এমন দশা হইবে কেন? আজ যে তুমি লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, তিরস্কৃত, পরপদানত, অন্নবস্ত্রহীন, দাসানুদাস ভিক্ষুক, জগতে তোমার এমন অবস্থা হয় কেন? কোন্‌ দিন তুমি এবং তোমাদের সাহিত্য-সংসারের এই সার সংটি বলিয়া বসিবেন, অসভ্য ভারতের বাতাসে অক্সিজেন বাষ্পই ছিল না এবং বিদ্যুৎ খেলাইতে পারে ভারতের অশিক্ষিত আকাশ এমন এন্‌লাইটেণ্ড্‌ ছিল না।

ভাই বাঙালি, তুমি এন্‌লাইটেণ্ড্‌, বাতাসের সঙ্গে তুমি অনেক অক্সিজেন বাষ্প টানিয়া থাক এবং তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে। আমি মূর্খ, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই, ভাই, আমি বিশ্বাস করি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল এবং অক্সিজেন বাষ্পের অস্তিত্বও অবিদিত ছিল না। কেন বিশ্বাস করি? আগে নিষ্ঠার সহিত কূর্ম কল্কি ও স্কন্দ পুরাণ পাঠ করো, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি স্থাপন করো, ম্লেচ্ছের অন্ন যদি খাইতে ইচ্ছা হয় তো গোপনে খাইয়া সমাজে অস্বীকার করো,

যতটুকু নব্য শিক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিতে পারিবে কেন বিশ্বাস করি। আজ তোমাকে যাহা বলিব তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমার যুক্তি তোমার কাছে অজ্ঞের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রদর্শন করিবে ইহাও কি সম্ভব! যে ম্লেচ্ছগণ শত শত আর্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উষ্ণীষ ও শিখা -সমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে?

এই তো গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি যবনগণের দ্বারাই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের প্রাচীন নাম লোপ না হইবে, তবে তাহা গেল কোথায়— তবে কোথাও তাহার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না কেন? প্রাচীন শাস্ত্রে এত শত ঋষি-মুনির নাম আছে, তন্মধ্যে গল্বন ঋষির নাম বহু গবেষণাতেও পাওয়া যায় না কেন? যে পবিত্র ভারতে দধীচি বজ্রনির্মাণের জন্য নিজ অস্থি ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন, ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন, এবং জহ্নুমুনি গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া জানু দিয়া নিঃসারিত করিয়াছেন, যে ভারতে ঋষিবাক্যপালনের জন্য বিন্ধ্যপর্বত আজিও নতশির, সেই ভারতের সাহিত্য হইতে অক্সিজেন বাষ্পের নাম পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়াছে, সর্বসংহারক যবনের উপদ্রবই যদি তাহার কারণ না হয়, তবে হে ভাই বাঙালি, তাহার কী কারণ আছে জিজ্ঞাসা করি।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, ইতিহাসের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যবনেরা প্রাচীন ভারতের বহুতর কীর্তি লোপ করিয়াছে। এ কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ যে আমরা নিন্দিত অপমানিত ভীত ত্রস্ত ভয়গ্রস্ত রিক্তহস্ত অস্তংগমিতমহিমা পরাধীন হইয়াছি, ভারতে যবনাধিকারই তাহার একমাত্র কারণ। এতটা দূরই যদি স্বীকার করিতে পারিলাম, তবে আমাদের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের নামও যে সেই দুরাত্মারাই লোপ করিয়াছে এটুকু যোগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবার তিলমাত্র কারণ দেখি না।

চতুর্থ যুক্তি, যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্বিচারে বহুতর পূত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সেজন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোনো উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার

করে সে পাষণ্ড, হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী! অতএব, তাহার কথার কোনো মূল্য থাকিতে পারে না; সে যে-সকল প্রমাণ আহরণ করে কোনো প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতেই পারেন না।

এমন যুক্তি আমরা আরও অনেক দিতে পারি। কিন্তু আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।

১২৯৮

লেখার নমুনা

সম্পাদকমহাশয় -সমীপেষু—

ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শিখেন নাই। অমন মৃদুসম্ভাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমাদের এজেন্সি আপিস হইতে একটা লেখার নমুনা পাঠাইতেছি। পছন্দ হইলে ছাপাইবেন, দাম দিতে ভুলিবেন না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি সাহিত্যসংসারে এক জন সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গালার ভূগোলে সাহিত্যসংসার কোথায় আছে ঠিক জানি না; এই পর্যন্ত জানি, আমাদের বিখ্যাত লেখককে তাঁহার ঘরের লোক ছাড়া আর কেহই চেনেন না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, সাহিত্যসংসার বলিতে তিনি, তাঁহার বিধবা পিসি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বুঝায়। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসংসারটির জীবিকা আমাদের খ্যাতনামা লেখকটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল সময়ে রুচি রক্ষা করিয়া, সত্য রক্ষা করিয়া, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া লিখিলে ইঁহার কোনোমতে চলে না; অতএব উপযুক্ত লেখক এমন আর পাইবেন না।

তবু কেন বলি

দেখিয়া বিস্মিত আশ্চর্য এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কী বলিব, চক্ষে জল আসে, কান্না পায়, অশ্রুসলিলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, যখন দেখিতে পাই, যখন প্রত্যহ এমনকি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যায়— কী দেখা যায়! পোড়া মুখে কেমন করিয়া বলিব কী

দেখা যায়! বলিতে লজ্জা হয়, শরম আসে, মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা হয়, উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে, মাতঃ বসুন্ধরে, জননী, মা, মা গো, একবার দ্বিধা হও মা— একবার দুখানা হইয়া ভাঙিয়া যা মা, সন্তানের লজ্জা নিবারণ কর্ জননী। ভাই বঙ্গবাসী, বুঝিয়াছ কি, কোন্ কলঙ্কের কথা, কোন্ লাঞ্ছনার কথা, কোন্ দুঃসহ লজ্জার কথা বলিতেছি, ব্যক্ত করিতেছি, প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে? না, বোঝ নাই, তোমরা বুঝিবে কেন ভাই? তোমরা মিল্ বোঝ, স্পেন্সর বোঝ, তোমরা শেলির আধো-আধো ছায়া-ছায়া ভাঙা-ভাঙা কবিত্ব বোঝ, তোমরা গরিবের কথা বুঝিবে কেন, দরিদ্রের কথা শুনিবে কেন, এ অকিঞ্চনের ভাষা তোমাদের কানে যাইবে কেন? কিন্তু ভাই, একটি প্রশ্ন আছে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, গুণমণি, ওই মুখের একটি উত্তর শুনিতে চাই— আচ্ছা ভাই, পরের কথা বোঝ, আর আপনার লোকের কথা বোঝ না, বাহিরের কথা বোঝ আর ঘরের কথা বুঝিতে পার না, যে আপনার নয় তাহার কথা বোঝ— যে আপনার তাহার কথা বোঝ না? বোঝ না তাহাতেও দুঃখ নাই, তাহাতেও খেদ নাই, তাহাতেও তিলার্ধমাত্র শোকের কারণ নাই, কিন্তু ভাই, কথাটা যে একেবারেই হৃদয়ঙ্গমই হয় না, একেবারে যেন অবোধের মতো বসিয়া থাক! সেই তো আমাদের দুর্দশা, সেই তো আমাদের দুরদৃষ্ট। ভাই বাঙালি, জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে, যে কথা আজিকার দিনে কেহ বুঝিবে না সে কথা তুলিলে কেন, উত্থাপন করিলে কেন? যে কথা সবাই ভুলিয়াছে সে কথা মনে করাইয়া দাও কেন? যে দুর্বিষহ বেদনা, যে দুঃসহ ব্যথা, যে অসহ্য যন্ত্রণা নাই তাহাতে আঘাত দাও কেন? আমিও তো সেই কথা বলি ভাই। এই ভাঙা মন্দিরে এই ভাঙা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কেন তুলি! এই শ্মশানের চিতানলে আবার কেন নূতন করিয়া নয়নজল নিক্ষেপ করি! আর্যজননীর সমাধিক্ষেত্রে এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসিত সভ্যচালিত নবসভ্যতার দিনে আবার কেন নূতন করিয়া নীরবতার তরঙ্গ উত্থিত করি! কেন করি! তোমরা কী করিয়া বুঝিবে ভাই, কেন করি! তুমি যে ভাই, সভ্য, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে ভাই, নবসভ্যতার নূতন বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন তানে নূতন গান ধরিয়াছ, নূতন রসে নূতন মজিয়া নূতন ভাবে নূতন ভোর হইয়াছ, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে এ কথা কখনো কিছু শোন নাই এবং আজ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি যে এ কথা কখনো কিছু বোঝ নাই এবং আজ একেবারেই বোঝ না, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তবু জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি? আমি যে ভাই, তোমাদের মিল্ পড়ি নাই, তোমাদের স্পেন্সর পড়ি নাই, তোমাদের ডারুয়িন পড়ি

নাই; আমি যে ভাই, তোমাদের হক্‌স্‌লি এবং টিণ্ড্যাল, রাস্কিন এবং কার্লাইল পড়ি নাই এবং পড়িয়া বুঝিতে পারি নাই; আমি যে ভাই, কেবলমাত্র ষড়্‌দর্শন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ, সংহিতা এবং পুরাণ, আগম এবং নিগম, উপক্রমণিকা এবং ঋজুপাঠ- প্রথম ভাগ পড়িয়াছি— ওই-সকল গ্রন্থ এই পতিত ভারতে আমি ছাড়া আর যে কেহ পড়ে নাই এবং বুঝে নাই ভাই। তবু আবার জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি! প্রাণের ভাইসকল, আমি যে পাগল, বাতুল, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত, আমার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত!

ভাই বাঙালি, এখন বুঝিলে কি, কেন করি, অবোধ অশ্রু কেন পড়ে, পোড়া চোখের জল কেন বারণ মানে না, কেন মিছে অরণ্যে রোদন, অস্থানে ক্রন্দন করিয়া মরি! নীরব হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত হইল কি, এই ভস্মীভূত প্রাণের শিখা দেখিতে পাইলে কি, শুষ্ক অশ্রুধারা দুই কপোল বাহিয়া কি প্রবাহিত হইল? যে ধ্বনি কখনো শোন নাই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে কি, যে আশা কখনো হৃদয়ে স্থান দাও নাই তাহার নৈরাশ্য তিলমাত্র অনুভব করিলে কি, যাহা বুঝাইতে গেলে বুঝানো যায় না এবং যাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা উত্তরোত্তর অসাধ্য হইয়া উঠে তাহা কি আজ তোমাদের এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারুদ্ধ বধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।—

সম্পাদক মহাশয়, আজ এই পর্যন্ত প্রকাশ করা গেল। কারণ, ইহার পরের প্যারাগ্রাফেই আমাদের লেখক আরম্ভ করিয়াছেন, 'যদি না করিয়া থাকে তবে আমি ক্ষান্ত হইলাম, নীরব হইলাম, তবে আমি মুখ বন্ধ করিলাম, তবে আমি আর একটি কথাও কহিব না— না, একটিও না।' এই বলিয়া কেন কথা কহিবেন না, শ্মশানক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ ফল হয় এবং সমাধিক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ নিষ্ফল হয়, এবং কথা না বলিলেই বা কিরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইলেই বা কিরূপ কথা বাহির হইতে থাকে, তাহাই ভাই বাঙালিকে পুনরায় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। এই অংশটি এত দীর্ঘ যে আপনার কাগজে স্থান হইবে না। পাঠকদিগকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে, প্রবন্ধটি অবিলম্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৫৵০ মাত্র, কিন্তু যাঁহারা ডাক-মাশুল -স্বরূপে উক্ত ৫৵০ পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে।

—সাহিত্য এজেন্সির কার্যাধ্যক্ষ

সারবান সাহিত্য

নাটক

সম্পাদক মহাশয়,

আজকাল বাঙলা সাহিত্যে রাশি রাশি নাটক-নভেলের আমদানি হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই। না আছে তত্ত্বজ্ঞান, না আছে উপদেশ। কী করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, গোজাতির রোগনিবারণ করিবার কী কী উপায় আছে, দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্ বাদ শ্রেষ্ঠ, কফ পিত্ত ও বায়ু -বৃদ্ধির পক্ষে দিশি কুমড়া ও বিলাতি কুমড়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কি না, অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে— আমাদের অগণ্য কাব্য-নাটকের মধ্যে এ-সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না। একবার কল্পনা করিয়া দেখুন, যদি কোনো নাটকের পঞ্চমাঙ্কের সর্বশেষভাগে এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় যদ্দ্বারা জৈবশক্তি ও দৈবশক্তির অন্যোন্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয় অথবা সৃষ্টিবিকাশের ক্রমপর্যায় নাটকের অঙ্কে অঙ্কে বিভক্ত হইয়া দুর্গম জ্ঞানশিখরের মরকত-সোপান-পরম্পরা রচিত হয়, তবে রসগ্রাহী সহৃদয় পাঠকেরা কিরূপ পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখন যে-সকল অসার ম্লেচ্ছভাবসংস্পর্শ-দূষিত গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া বাবুরা সাহেব এবং ঘরের গৃহিণীরা বিবি হইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে আমি নাটক-উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় পঞ্জিকা নাট্যাকারে বাহির করিব স্থির করিয়াছি। গ্রহ-ফলাফলের প্রতি বর্তমান কালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাবু-বিবি-দিগের বিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিবার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। সাধারণের চিত্ত-আকর্ষণের অভিপ্রায়ে এই নাটকের কিঞ্চিৎ নমুনা মহাশয়ের জগদ্‌বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

নাটকের পাত্রগণ

হর

পার্বতী

প্রথম অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাসপর্বত

হরপার্বতী

পার্বতী। নাথ!

হর। কেন প্রিয়ে?

পার্বতী। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ হইতে কয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে সেই মনোহর প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

হর। (সহাস্যে) প্রিয়ে, পঞ্জিকার প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ষারম্ভ-দিনে এই পরমজিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছি। জীবিতবল্লভে, আজও কি এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিল না?

পার্বতী। প্রাণনাথ, জানই তো আমরা বুদ্ধিহীন নারীজাতি, বিশেষত আজ-কালকার বিবিদের মতো ফিমেল ইস্কুলে পড়ি নাই। (বোধ করি সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন, এইখানে বর্তমান শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করা হইল। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা অনেকটা নিবারণ হইবে। —লেখক) হৃদয়নাথ, অহর্নিশি একমাত্র পতিচিন্তা ব্যতীত যাহার আর কোনো চিন্তা নাই তাহার স্মৃতিপটে অতগুলা মনুর কথা কিরূপে অঙ্কিত হইবে। হাজার হউক, তাহারা তো পরপুরুষ বটে। (বর্তমান কালের পাঠিকারা এইস্থল হইতে পতিভক্তির সুন্দর উপদেশ পাইবেন। —লেখক)

হর। প্রিয়তমে, তবে অবহিত হইয়া মনোহর কথা শ্রবণ করো। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দের পর হইতে ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু। তৃতীয় ঔত্তমজ মনু। চতুর্থ তামস মনু। পঞ্চম রৈবত মনু। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু। সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। সপ্তবিংশতি যুগ গত হইয়াছে। অষ্টবিংশতি যুগে কলিযুগের প্রারম্ভ। তত্র চতুর্যুগের পরিমাণ বিংশতি-সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ-পরিমিত বর্ষ।

পার্বতী। (স্বগত) অহো কী শ্রুতিমনোহর! (প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বর, এবার সত্যযুগোৎপত্তির কাল নিরূপণ করিয়া দাসীর কর্ণকুহর সুধাসিক্ত করো।

হর। প্রিয়ে, তবে শ্রবণ করো। বৈশাখ শুক্লপক্ষ অক্ষয়তৃতীয়া রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তি। ইত্যাদি।

(এইরূপে কাব্যকৌশলসহকারে প্রথম অঙ্কে একে একে চারি যুগের উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইবে। —লেখক)

•

দ্বিতীয় অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস

বৃষস্কন্ধে মহেশ এবং শিলাতলে হৈমবতী আসীনা। নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য হরপার্বতীর নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে বৃষের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কোনো রঙ্গভূমিতে এই নাটকের অভিনয় হয়

নিশ্চয়ই বৃষ সাজিবার লোকের অভাব হইবে না। বক্ষ্যমাণ অঙ্কে পার্বতী মধুর সম্ভাষণে মহেশ্বরের নিকট হইতে বর্ষফল জানিয়া লইতেছেন। এই অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে সোনার ভারতের দুর্দশায় পার্বতীর বিলাপ এবং রেলগাড়ি প্রচলিত হওয়াতে আর্যাবর্তের কী কী অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে আঢ়কেশফল কুড়বেশফল এবং গোটিকাপাতফল -নামক সুখশ্রাব্য প্রসঙ্গে এই অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস

গজচর্মে ত্র্যম্বক ও অম্বিকা আসীনা

নাট্যশালায় গজচর্মের আয়োজন যদি অসম্ভব হয়, কার্পেট পাতিয়া দিলেই চলিবে। এই দুই অঙ্কে বারবেলা, কালবেলা, পরিঘযোগ, বিষ্কম্ভযোগ, অসৃকযোগ, বিষ্টিভদ্রা, মহাদগ্ধা, নক্ষত্রফল, রাশিফল, ববকরণ, বালবকরণ, তৈতিলকরণ, কিস্তুঘ্নকরণ, ঘাতচন্দ্র, তারাপ্রতিকার, গোচরফল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। অভিনেতাদিগের প্রতি লেখকের সবিনয় অনুরোধ, এই দুই অঙ্কে তাঁহারা যথাযথ ভাব রক্ষা করিয়া যেন অভিনয় করেন— কারণ অরিদ্বিদশ এবং মিত্রষড়ষ্টক -কথনে যদি অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে ভিন্নতা না থাকে, তবে দর্শকগণের চিত্তে কখনোই অনুরূপ ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না। —লেখক

পঞ্চমাঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস

সিংহের উপর ত্রিপুরারি ও মহাদেবী আসীন

(সিংহের অভাবে কাঠের চৌকি হইলে ক্ষতি নাই। —লেখক)

মহাদেবী। প্রভু, দেবদেব, তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তোমার নখদর্পণে ; এইবার বলো দেখি ১৮৭৯ সালের এক আইনে কী বলে।

ত্রিপুরারি। মহাদেবী, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, তবে অবধান করো। কোনো-একটি বিষয়ের অনেকগুলি দলিল হইলে তাহার মধ্যে প্রধান খানিতে নিয়মিত স্ট্যাম্প, অপর-গুলিতে এক টাকা অনুসারে দিতে হয়।

ইহার পর দলিল রেজেস্টরির খরচা, তামাদির নিয়ম, উকিল-খরচা, খাজনা-বিষয়ক আইন, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স, বাঙ্গিডাক, মনিঅর্ডার, সর্বশেষ সাউথ ইস্টার্ন্‌ স্টেট রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার কথা বিবৃত করিয়া যবনিকাপতন। এই অঙ্কে যে ব্যক্তি সিংহ সাজিবে তাহার কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকিতে পারে ; অতক্ষণ দুই

জনকে স্কন্ধে করিয়া হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন ব্যাপার! সেই জন্য উকিল-খরচা-কথনের মধ্যে সিংহ একবার গর্জন করিয়া উঠিবে, 'মা, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।' মা বলিবেন, 'তা, যাও বাছা, সাহারা মরুতে তোমার শিকার ধরিয়া খাও গে, আমরা নীচে নামিয়া বসিতেছি।' হামাগুড়ি দিয়া সিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই সুযোগে দর্শকেরা সিংহের আবাসস্থলের পরিচয় পাইবেন।— আমার কোনো কোনো নব্যবন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মধ্যে নন্দীভৃঙ্গীর হাস্যরসের অবতারণা করিলে ভালো হয়। কিন্তু তাহা হইলে নাটকের গৌরব-লাঘব হয়। এইজন্য হাস্যপ্রগল্‌ভতা আমি সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি। ভবিষ্যতে সুশ্রুত ও চরক -সংহিতা নাট্যাকারে রচনা করিবার অভিলাষ আছে এবং উপন্যাসের ন্যায় লঘু সাহিত্যকে কতদূর পর্যন্ত সারবান করিয়া তোলা যাইতে পারে পাঠকদিগকে তাহারও কিঞ্চিৎ নমুনা দিবার সংকল্প করিয়াছি।

ভবদীয় একান্ত অনুগত শ্রীজনহিতৈষী
সাহিত্যপ্রচারক

১২৯৮

মীমাংসা

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনো আমাদের বাড়ির ছাদে উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড়ো ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনো চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যা-বেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রিকার সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন 'বারণ কর্‌ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না'।

বুঝিতে পারি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছেন—

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?

উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধূ নই। কারণ, আমি পুরুষমানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোকরা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে— প্রত্যুষ হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সারিগম সাধিতেছে। পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে; এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর সিকিসুর তফাত দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে; ঘরে আর কিছুতে মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন 'বারণ কর্ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না'। শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম সাধিতেছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

বোধ হয় চণ্ডীদাসের বাসার পাশে কন্সর্টের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোকরা বাঁশি অভ্যাস করে বোধ হয় তাহারই নাম মুকুন্দ ঘোষ।

—শ্রীসংগীতপ্রিয়

আমার এ কী হইল! এ কী বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই! থাকিয়া থাকিয়া 'চমকি চমকি উঠি'।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।

শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী সখীকে ডাকিয়া বলি, 'উহু উহু, সখী, দ্বার রোধ করিয়া দাও।'

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব।

মনোহরা শারদপূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী! কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে?

আমার ন্যায় আর-কোনো হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।

অন্যত্র লিখিয়াছেন 'নিশি নিশি রুজমুপযাতি'। আমারও সেই দশা। রাত্রেই বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কী হইল?

উত্তর

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পুবে হাওয়া বহিলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও সেটা ভালোই কর। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ওই এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ বাত পয়ার এবং জোয়ার-ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভালো ডাক্তার ছিল না, তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

—নূতন-উত্তীর্ণ ডাক্তার

১২৯৮

পয়সার লাঞ্ছনা

আমাদের আপিসের সাহেব বলে, বাঙালির বেশি বেতনের আবশ্যক নাই। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, ভদ্র বাঙালির ছেলের পক্ষে মাসিক পঁচিশ টাকা খুব উচ্চ বেতন। আমাদের অবস্থা এবং আমাদের দেশের সম্বন্ধে সাহেবরা যখন একটা মত স্থির করে তখন তাহার উপর আমাদের কোনো কথা বলা প্রগল্‌ভতা। কেবল সাহেবের প্রতি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূচক বিশেষণ -প্রয়োগপূর্বক মনের ক্ষোভে আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি করি— সাহেব সবই তো জানেন।

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মের অর্থ এই— যাহার একটার অভাব তাহার আর-একটার বাহুল্য প্রায়ই থাকে। আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত।

কিন্তু জগতের এ নিয়ম কোনো কোনো জগদ্‌বাসীর পক্ষে যেমনই আনন্দজনক হউক আমাদের পক্ষে ঠিক তেমন সুবিধার বোধ হয় নাই। কেবল অগত্যা সহিয়াছিলাম, কিন্তু যেদিন আমাদের উপরে একটা কর্ম খালি হইল এবং বাহির হইতে একটা কাঁচা ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রমোশন বন্ধ করা হইল, সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ইচ্ছা হইল তখনই কাজ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই, একটা মিউটিনি করি, ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই, পার্লামেণ্টে একটা দরখাস্ত করি, স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে একটা বেনামি পত্র লিখি। কিন্তু তাহার কোনোটা না করিয়া বাড়িতে চলিয়া গিয়া সেদিন আর জলখাবার খাইলাম না, খোকার সর্দি হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলাম, স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল, আমি সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায় রে পয়সা, তোর জন্য এত অপমান!

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার কাছে আসিলেন না, কিন্তু নিঃশব্দচরণে নিদ্রাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কখন দেখিতে পাইলাম— আমি একটি পয়সা। কিছু আশ্চর্য বোধ হইল না। কবে কোন্‌ সনাতন টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছি যেন মনেও নাই। এই পর্যন্ত অবগত আছি যে, ব্রহ্মার পা হইতে যেমন শূদ্রের উৎপত্তি সেইরূপ টাঁকশালের অত্যন্ত নিম্নবিভাগেই আমাদের জন্ম।

সেদিন সিকি দু-আনির একটা মহতী সভা বসিবে কাগজে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন পড়া গিয়াছিল। হাতে কাজ ছিল না, কৌতূহলবশত গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেয়ালের কাছে একটা কোণে আশ্রয় লইলাম।

সুকুমারী সহধর্মিণী দু-আনিকে সযত্নে বামপার্শ্বে লইয়া শুভ্রকায় চার-আনিগুলি দলে দলে আসিয়া সভাগৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা বাস করে কেহ বা কোটের পকেটে, কেহ বা চামড়ার থলিতে, কেহ বা টিনের বাক্সে। কেহ কেহ বা অদৃষ্টগতিকে আমাদের প্রতিবেশীরূপে আমাদের পাড়ায় ট্যাঁকের মধ্যেও বদ্ধ হইয়া দিনযাপন করে।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়টা এই যে, আমরা পয়সার সহিত সর্বতোভাবে পৃথক হইতে চাহি, কারণ, উহারা বড়ই হীন। দু-আনিরা সুতীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কহিল, এবং উহারা তাম্রবর্ণ ও উহাদের গন্ধ ভালো নহে। আমার পাশে একটি দু-আনি ছিল, সে ঈষৎ বাঁকিয়া বসিয়া নাসাগ্র কুঞ্চিত করিল, তাহার পার্শ্ববর্তী চার-আনি আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইল, আমি তো একেবারে সংকোচে সিকিপয়সা হইয়া গেলাম। মনে মনে কহিলাম, আমাদেরই তো আটটা ষোলোটা হজম করিয়া

তোমাদের আজ এত মূল্য, সেজন্য কি কিছু কৃতজ্ঞতা নাই? মাটির নীচে তো উভয়ের সমান পদবী ছিল।

সেদিন প্রস্তাব হইল গৌরমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রার জন্য স্বতন্ত্র টাঁকশাল স্থাপিত হউক। যদিও এক মহারানীর ছাপ উভয়ের উপর মারা হইয়াছে, তাই বলিয়া কোনোরূপ সাম্য আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা এক ট্যাঁক, এক থলি, এক বাক্সে বাস করিব না। এমনকি সিকি দু-আনি ভাঙাইয়া পয়সা করা ও পয়সা ভাঙাইয়া সিকি দু-আনি করা এরূপ অপমানজনক আইনও আমরা পরিবর্তন করিতে চাহি। সাম্যবাদের গৌরব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। গিনি মোহরের সহিত সিকি দু-আনি এক সাম্যসীমার অন্তর্গত, কিন্তু তাই বলিয়া সিকি দু-আনির সহিত পয়সা!

সকলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কখনোই নহে! কখনোই নহে! দু-আনির তীব্র কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চে শোনা গেল। যে খনিতে আমার আদিম উৎপত্তি সেই খনির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় আমি বসুমতীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিলাম, বসুমতী সে অনুরোধ পালন করিল না— দেয়াল ঘেঁষিয়া রক্তবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় এক ঝক্‌ঝকে নূতন আট-আনি গড়াইয়া এই সিকি দু-আনির সভার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিলাম সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। সতেজে বক্তৃতা দিতে লাগিল, ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চারি দিকে করতালি পড়িল।

কিন্তু আমি ঠাহর করিয়া শুনিলাম, বক্তৃতাটা যেমন হউক আওয়াজটা ঠিক রূপালি ছাঁদের নহে। মনে বড়ো সন্দেহ হইল। সভা যখন ভঙ্গ হইল, ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া বহুসাহসপূর্বক তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম— ঠন করিয়া আওয়াজ হইল, সে আওয়াজটা অত্যন্ত দিশি এবং গন্ধটাও দেখিলাম আমাদের স্বজাতীয়ের মতো। মহা রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, তুমি কোথাকার অসভ্য হে! আমি কহিলাম, বৎস, তুমিও যেখানকার আমিও সেখানকার। ছোঁড়াটা আমাদের নিম্নতন কুটুম্ব— আধ-পয়সা; কোথা হইতে পারা মাখিয়া আসিয়াছে।

তাহার রকম-সকম দেখিয়া হা-হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, স্ত্রী পাশে শুইয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইলাম। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, বড়ো ধরা পড়িয়াছে! কিন্তু মনে করিতেছি আমিও কাল হইতে পারা মাখিয়া আপিসে যাইব।

আমার স্ত্রী কহিল, তাহার অপেক্ষা পারা খাইয়া মরা ভালো।

১৩০০

কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প

একদা কয়েক জন কাঠুরিয়া এক পার্বত্য সরল বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে মনোযোগী হইয়াছিল। শ্রম লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর পরামর্শপূর্বক তাহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। যে শাখা ছেদনের আবশ্যক কয়েক জনে মিলিয়া তাহারই উপর চড়িয়া বসিল এবং নিভৃতে বসিয়া সতর্কতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শাখা ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং কাঠুরিয়া কয়েকটিও তৎসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কাঠুরিয়ার সর্দার এই সংবাদ-শ্রবণে অধীর হইয়া সেই তরুসমীপে উপস্থিত হইল এবং কুঠার আস্ফালন করিয়া কহিল, 'তুমি যে অপরাধ করিয়াছ আমি তাহার বিচার করিতে চাহি।'

বনস্পতি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হে জনপুঙ্গব, আমার স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া আমারই শাখাচ্ছেদন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহার বিচার করিবে?'

মানব আরক্তলোচনে কহিল, 'আমার কয়েক জন কাঠুরিয়া যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহার জন্য কেহই দণ্ড পাইবে না এ কখনো হইতে পারে না।'

বনস্পতি ভীত হইয়া কম্পিত মর্মরস্বরে কহিল, 'প্রভু, তাঁহারা সুবুদ্ধিসহকারে মানবচাতুরী অবলম্বন করিয়া যেরূপ কাণ্ড করিয়াছিলেন, আশ্চর্য কার্যনৈপুণ্যবশত অবিলম্বেই তাহার ফললাভ করিয়াছেন— আমি মূঢ় বৃক্ষ, তাহার প্রতিবিধান করি এমন সাধ্য ছিল না।'

মানব কহিল, 'কিন্তু তোমারই শাখা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'

বনস্পতি কহিল, 'সে কথা যথার্থ, কারণ আমারই শাখায় তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্য।'

মানব সুযুক্তিসহকারে কহিল, 'অতএব তোমাকেই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে বলিতে থাকো, আমি এক্ষণে কুঠারে শান দিতে চলিলাম।'

তাৎপর্য

অনবধানবশত যদি হুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড়-পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।

১২৯৮

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ

মীটিঙে প্রায় সকল দেবতাই একযোগে স্ব স্ব কর্মে রিজাইন দিতে উদ্যত হইলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বৈদিক ভাষায় উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত -সংযোগপূর্বক কহিলেন, 'ভো ভো দেবগণ শৃণ্বন্তু।

'আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এই বিশ্বসৃষ্টি এবং বেদরচনা সমাপ্ত করিয়া সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া পেন্‌শন লইয়াছি। এমনকি, আমার কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নাই বলিয়া সকলে আমার পূজা পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। এবং আমার প্রথম বয়সের বিশ্ব এবং বেদ -নামক দুটো রচনা লইয়া লোকে নির্ভয়ে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ এবং সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলে, রচনা মন্দ হয় নাই, কিন্তু আরও ঢের ভালো হইতে পারিত ; কেহ বলে, আমাদের হাতে যদি প্রুফ-সংশোধনের ভার থাকিত তাহা হইলে ছত্রে ছত্রে এত মুদ্রাকরপ্রমাদ থাকিত না। আমি চুপ করিয়া থাকি, মনে মনে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলি, বাবা, ওই আমার প্রথম রচনা। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক পাকা হইয়াছ, কিন্তু তখন যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না ; একেবারে সমস্তই মন হইতে গড়িতে হইয়াছিল। তৎপূর্বে তোমরা যদি একটু মনোযোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে সমালোচনা শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিতাম, একটা মস্ত স্ট্যাণ্ডার্ড্ পাওয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা বড়োই বিলম্বে জন্মিয়াছ। যাহা হউক, যখন দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবে তখন তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব।

'আবার কেহ কেহ, রচনা দুটো যে আমার তাহা একেবারে অস্বীকার করে। হয়তো অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিত ওটা তাহাদেরই নিজের, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার খর্বতা স্বীকার করা হয় বলিয়া ক্ষান্ত আছে। হরি হরি! এই দীর্ঘজীবনে ওই দুটো বৈ আর কোনো দুষ্কর্ম করি নাই, ইহাতেই এত কথা শুনিতে হইল।

'যাহা হউক এ তো গেল আমার আক্ষেপের কথা। কিন্তু তোমরা কী মনোদুঃখে, মর্তলোকের প্রতি কী অভিমানে তোমাদের বহুকালের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?'

তখন দেবতারা কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক ভাষায়, কেহ বা ত্রিষ্টুভ কেহ বা অনুষ্টুভ ছন্দে, দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব এবং তিন সয়ের উচ্চারণ

রক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভগবন্, সায়ান্স্-নামক একটা দানব অত্যন্ত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহার নিকটে বৃত্র প্রভৃতি প্রাচীন অসুরদিগকে গণ্যই করি না।'

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে হাসিলেন ; ভাবিলেন, কোনোমতে মানে মানে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ, এখন তাহাকে গণ্য না করিলেও চলে। কিন্তু তখন যে নাকালটা হইয়াছিলে সে বেশ মনে আছে। কিন্তু সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া গম্ভীরভাবে চারিটি মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, 'অবশ্য অবশ্য।'

সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, 'আর্য, শত্রুটাকে তত ডরাই না, কিন্তু মিত্রদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়াছি। এতদিন আমরা ছিলাম মানুষের হৃদয়লোকে বিশ্বাসের স্বর্গধামে ; এখন তাহারা সায়ান্সের সহিত গোপনে সন্ধিস্থাপনপূর্বক সেখান হইতে নির্বাসিত করিয়া আমাদিগকে মাথার খুলির এক কোণে অত্যন্ত শুষ্ক সংকীর্ণ জায়গায় একটুখানি স্থান দিতে চায়। সেখানে একফোঁটা বিশ্বাসের অমৃত নাই। বলে, দেখো, তোমাদের কত গৌরব বাড়িল। ছিলে অজ্ঞানান্ধ হৃদয়গহ্বরে, এখন উঠিলে মস্তিষ্কঘৃতজ্বালিত জ্ঞানালোকিত মস্তকচূড়ায়। ভাগ্যে আমরা কয়জনা বুদ্ধিমান ছিলাম, নতুবা স্বর্গে মর্তে কোথাও তোমাদের স্থান হইত না। আমরা সকলের কাছে প্রমাণ করিয়াছি যে, তোমরা আর কোথাও যদি না থাক, নিদেন আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে আছ। প্রতিবাদ করিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে বিচলিত করে এমন বুদ্ধিমান এখনো কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বিষ্ণুর মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলিকে আমরা এভোল্যুশন থিওরি বলিয়া প্রচার করিয়াছি। দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।

'ভগবন্, যথার্থ আন্তরিক ভক্তি কখনোই নিজের দেবতাকে লইয়া এরূপ ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করে না। দেব চতুরানন, এতকাল দেবতা ছিলাম, কেবল মাঝে মাঝে দৈত্যদের উপদ্রবে স্বর্গছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এপর্যন্ত আমাদিগকে কেহ এভোল্যুশন্ থিওরি করিয়া দেয় নাই। প্রভু, তুমি যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক তুমি জান আমরা কী, কিন্তু আজকাল তোমার অপেক্ষা যাহারা কিঞ্চিৎ বেশি শিখিয়াছে তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করো। বড়ো আশা দিয়াছিলে তোমার দেবতারা অমর, কিন্তু এইভাবে যদি কিছুদিন চলে, আমাদের মানব বন্ধুরা যদি সংঘাতিক স্নেহভরে আরও কিছুকাল আমাদের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তবে সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।'

বৃহস্পতির মুখে এই-সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চারিটি শুভ্র মস্তক নত করিয়া চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন দেবতাগণ স্ব স্ব পদ সম্বন্ধে পরিবর্তন প্রার্থনা করিলেন। বিজ্ঞ দেবতা প্রজাপতি এবং বালক দেবতা কন্দর্প সুরসভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'সকলেই জানেন, বিবাহ-ডিপার্ট্‌মেন্টে বহুকাল আমাদের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব ছিল; সেজন্য আমাদের কোনো-রূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপরি-পাওনা ছিল না বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি টাকা-নামক একটা চক্রমুখো হঠাৎ-দেবতা টঙ্কশালা হইতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ-চন্দ্রাকারে আবির্ভূত হইয়া একপ্রকার গায়ের জোরে আমাদের সে কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব উক্ত ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌ হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবলশক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক।'

সর্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

তখন যম উঠিয়া কহিলেন, 'এতকাল আমিই নরলোকের সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিলাম, কিন্তু এখন সেখানে আমা অপেক্ষা ভয় করে এমন-সকল প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, পুলিস-দারোগাকে আমার যমদণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আমি অদ্য হইতে কাজে ইস্তফা দিতে চাই।'

অধিকাংশ দেবতার মতে যমরাজের প্রস্তাব নিতান্ত অসংগত না হইলেও ব্যাপারটা গুরুতর বিধায় আগামী মীটিঙে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আপাতত স্থগিত রহিল।

কার্তিকেয় উঠিয়া কহিলেন, 'গুরুদেবের বক্তৃতার পর আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমি দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবগণকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, হয় আমার পোস্ট্‌ অ্যাবলিশ করিয়া এস্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্‌ কমানো হউক, নয় কোনো সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর স্বর্গরক্ষাকার্যের ভার দেওয়া হউক। এমনকি, আমার বহুকালের ময়ূরটিও আমি বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পেখম ছড়াইলে তাঁহাদের অনেকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হইবে।'

দেবতাদের সম্মতিক্রমে সেনাপতির পোস্ট্‌ অ্যাবলিশ হইল, এখন হইতে ময়ূরের খোরাকি তাঁহার নিজের তহবিল হইতে পড়িবে।

বরুণ উঠিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিলেন, 'নরলোকে আমার কি আর কোনো আবশ্যক আছে? খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী আমাকে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিয়াছে। এইবেলা মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে ইচ্ছা করি।'

দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই। কারণ, এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রাখর্য নিবারণের জন্য দুর্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

তখন ধর্ম বলিলেন, 'লোকাচারকে আমার অধীনস্থ কর্মচারী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে পরামর্শমাত্র না করিয়া আপন ইচ্ছামতো যাহা-তাহা করে, তবে সেই ছোঁড়াটাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম।' বায়ু কহিলেন, 'পৃথিবীতে এখন উনপঞ্চাশ দিকে উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতেছে, চাইকি, এখন আমি অবসর লইতে পারি।' আদিত্য কহিলেন, 'মানবসমাজে বিস্তর খদ্যোত উঠিয়াছে; তাহারা মনে করিতেছে, সূর্য না হইলেও আমরা একলা কাজ চালাইতে পারি। জগৎ আলোকিত করিবার ভার তাহাদের উপর দিয়া আমি অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।' ভগবান চন্দ্রমা শুক্লপ্রতিপদের কৃশমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, 'নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব যে পর্যন্ত কবিরমণী-মহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই।' এমনকি, ভোলানাথ শিব অর্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, 'আমা অপেক্ষা বেশি গাঁজা টানে পৃথিবীতে এমন লোকের তো অভাব নাই; সেই-সমস্ত সংস্কারকদিগের উপর আমার প্রলয়কার্যের ভার দিয়া আমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। এমনকি, আমি নিশ্চয় জানি, আমার ভূতগুলারও কোনো আবশ্যক হইবে না।'

সর্বশেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত মধুরস্বরে দেবসমাজে তাঁহার নিবেদন আরম্ভ করিলেন, তখন দেবগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহেন্দ্রের সহস্র চক্ষের পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

দেবী কহিলেন, 'অন্যান্য নানা কার্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপর ছিল, কিন্তু সে কার্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে— তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে-সকল পুস্তক নির্বাচিত হয় সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভালো হয়। অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক।'

যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, 'আমার কোনো আবশ্যক নাই, কারণ, ইস্কুলের মাস্টার এবং ইন্‌স্পেক্টর আছে।'

শিশুশিক্ষা-বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোনো মতভেদ রহিল না।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল।]

কথা ও কাহিনী

কথা ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র -সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।

—গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। কথা (প্রথম সংস্করণ)

মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) কথার কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয়— 'কাহিনী' ও 'কথা'। কথার প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন', সোনার তরীর 'গানভঙ্গ', চিত্রার 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি', মানসীর 'নিষ্ফল উপহার', তা ছাড়া কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত 'দীন দান' (ভারতী, ১৩০৭) কাহিনী অংশের অন্তর্গত হয়। কথার অবশিষ্ট কবিতাগুলি ও চিত্রার 'ব্রাহ্মণ' এবং মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা কথা অংশে মুদ্রিত হয়। পরে এই দুই অংশের কবিতা লইয়া ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ এই ভাবেই পরিচিত ও প্রচলিত।

কথা ও কাহিনীর পরবর্তী কোনো সংস্করণে কল্পনার 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি কাহিনী অংশে যোগ করা হইয়াছিল। কাহিনীতে সংকলিত অন্য কবিতাগুলির সহিত

সামঞ্জস্য না থাকায় রচনাবলী-সংস্করণে উহা কাহিনী হইতে বর্জিত এবং যথাপূর্ব কল্পনাতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কথার 'পূজারিনী' ও 'পরিশোধ' কবিতার গল্পাংশ অবলম্বনে কবি পরবর্তী কালে যথাক্রমে 'নটীর পূজা' নাটক (১৩৩৩) ও 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' (১৩৪৬) রচনা করিয়াছেন।

'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটির পাঠ 'কথা ও কাহিনী'তে বহুশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে; 'মানসী' হইতে উহার মূল পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরন ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায় কুশল,
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছল-ভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করযোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'

দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

উভয় পাঠে ছন্দের যে ভিন্নতা সে সম্পর্কে 'মানসী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিম্নলিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য—

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'ঊর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপে গণনা করা যায় নাই— পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।……

—গ্রন্থকার

'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, ১৯ ফাল্গুন ১৩৩০) রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই : একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিল ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিল রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান্ লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়। এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল ! নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমনকি, আমার মতো কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরোত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত। কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায় রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো।

—সাহিত্যের পথে

কল্পনা

কল্পনা ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নিকট কল্পনার অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হইয়াছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' 'পিয়াসী' ও 'প্রকাশ' কবিতার পাঠান্তর উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে সংকলিত হইল।

চৌরপঞ্চাশিকা

বহু বর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়
বেদনাবিহীন !

দীপ্তশিখাসম তব স্পন্দিত হৃদয়
স্তব্ধ বহু দিন!

ওগো চৌর কবি!
বিস্থা তব কনকচম্পকগৌরছবি
মধ্যাহ্নে-খসিয়া-পড়া চম্পকের মতো
ধূলিশয্যাগত
বহু বর্ষ শত!
বিরহের মিলনের সুতীব্র তাপন
চিরসমাপন।

তোমাদের সুনির্জন শয়নমন্দিরে
দীপানলশিখা
কবে যে নিবিয়া গেছে নিশীথসমীরে
নাহি তাহা লিখা।
তোমাদের দ্বারপ্রান্তে সখীবক্ষোলীনা
নাহি বাজে বীণা,
নাহি সেই বাতায়নে মালতীর লতা
পুষ্পভারনতা!

প্রত্যূষে নিকুঞ্জ হতে বন্দিনীর গান
কোথা অবসান!
ভেরী নাহি বেজে ওঠে প্রহরে প্রহরে
সিংহদ্বার-'পরে!
যবনীরা নবনীনির্মলশুভ্ররূপে
অলিন্দে বসিয়া
না কহে স্বদেশকথা অতি চুপে চুপে
দীর্ঘ নিশ্বসিয়া।

দূর হতে কঞ্চুকীর পদশব্দ শুনি
আচম্বিতে উঠি
বসন সম্বরি যত সলজ্জা তরুণী
নাহি যায় ছুটি !
শুধু দূর সেকালের বহি এক শোক
জপি এক নাম,
কেঁদে কেঁদে বিশ্বে তব পঞ্চাশটি শ্লোক
ফিরে অবিশ্রাম।
অনন্ত অধীর,
দেখে না শোনে না তারা অন্ধ ও বধির !
নাহি জানে কোথা রাজা কোথা রাজশালা,
কোথা তুমি কোথা তব প্রিয় কণ্ঠমালা
মুগ্ধা রাজবালা।
বিস্মৃত কাহিনী তব বিস্মিত জগতে
নব রাজপথে—
পুরাতন দিবসের একটি কাকলী
গাহিছে কেবলি !

পঞ্চাশটি শুক যেন গোপনে পালিত
রাজভবনের,
ছিল তারা তোমাদের সোহাগে লালিত
শুধু দুজনের।
পেত তারা অহরহ রাজবালিকার
ললিত চুম্বন,
শুনিত নয়ন মুদি করতালি তার
ক্বণিতকঙ্কণ !
ষোড়শীর ওষ্ঠ হতে দাড়িম্বের গুটি
খেত খুঁটি খুঁটি।
ওগো কবি চোর,
প্রেমলীলা-অবকাশে বসি বক্ষে তোর

গান শিখেছিল তারা চাঁদের আলোতে
তব মুখ হতে!

আজি সেই পঞ্চাশটি শুক শুকনারী
বসি সারি সারি,—
তোমাদের অনন্ত শয়নগৃহদ্বারে
চির অন্ধকারে—
তোমারি রচিত স্বর্ণ ছন্দের পিঞ্জরে
বাঁধা চিরদিন
শতবর্ষ এক গান গাহে এক স্বরে
বিশ্রামবিহীন—
ওগো কবি চোর,
নাহি ভাঙে তোমাদের চিরঘুমঘোর।

পিয়াসী

এখনো ভোরের অলস নয়নে তন্দ্রা ভাঙে নি ভালো
আকাশের কোণে বনের আড়ালে জাগিছে ধূসর আলো।
এখনো বাতাসে রয়েছে শিশির, ফোটে নি সকল কুঁড়ি—
মেলি দুটি আঁখি পাখা ঝাড়ি পাখি করিতেছে উড়ি-উড়ি।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ মন্দ প্রভাত-বায়ে,
তুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে বসিয়া অশথছায়ে
নবীননবনীনিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ—
শূন্যপাত্র হাতে লয়ে আমি দাঁড়ায়ে তৃষিত মুগ্ধ!

আম্রকাননে ধরেছে মুকুল ঝরি পড়ে পথপাশে—
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে মৌমাছি উড়ে আসে!
কাঁঠালের গাছে একটি কোকিল ডাকিছে করুণা-মাখা,
আঁধার পথের দু ধারে কাঁপিছে তরুণ বাঁশের শাখা!

সরোবর-পারে খুলিছে দুয়ার শিবমন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে দোহন করিছ দুগ্ধ—
কাননের কোণে আমি একমনে দাঁড়ায়ে রয়েছি লুব্ধ!

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল দেউলে, আকাশ উঠিল জাগি—
ধরণী চাহিল উর্ধ্বগগনে দেবতা-আশিস মাগি।
যত বনতলে যত পাখি ছিল গাহিল কণ্ঠ তুলি,
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িল গোখুরধূলি।
শিশুকলরব ধ্বনিয়া উঠেছে গৃহঅঙ্গনতলে,
কোমল বাহুতে কলস আঁকড়ি বধূরা চলেছে জলে।
তোমার কাঁকন বাজে ঘন ঘন, ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ—
পিয়াসী নয়ানে চেয়ে চেয়ে তাই পরান হতেছে ক্ষুব্ধ!

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

ধরা পড়া [প্রকাশ]

চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী সাথে তপনের
মেঘের সাথে বিজুরির
প্রণয় শুধু স্বপনের—
সে-সব চোখে চোখে কথা,
সে-সব মহাগোপনতা,
লুকানো কত ছল-ভরা—
কাহার কাছে কবে কোথা
প্রথমে পড়েছিল ধরা!

তখন মহাত্রিভুবন
ছিল না এত সাবধানে—
খসিয়া যেত আবরণ
আকারে ভাবে গীতে গানে।

তখন যদি রজনীতে
করিত খেলা তরুলতা
পরের দিনে কবিগীতে
রটিয়া যেত সে বারতা!
ভ্রমর যদি পথ ভুলে
বসিত কভু কেয়া ফুলে
অমনি ঘরে ঘরে তাহা
নিমেষে হত জানাজানি।
জগৎ পুরাকালে, আহা,
ছিল না এত সাবধানী!

একদা কবে মধুরাতে
মলয় উঠেছিল মাতি।
ভ্রমর গুনগুন গানে
বলিয়া গেল কানে কানে,
চতুর পিক দিকে দিকে
রটায়ে দিল কুহুতানে,
পাপিয়া তারি কাছে শিখে
বনের সভা-মাঝখানে
গাহিল মহা কলরবে—
'শুন গো, শুন, শুন সবে
চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী সাথে তপনের
মেঘের সাথে বিজুরির
প্রণয় অতি গোপনের।'

শুনিয়া যত নরনারী
উঠিল হাসি সারি সারি—
কহিল, 'বৃথা ছল করা,
সবাই পড়িয়াছে ধরা।'

কহিল চোখে চোখে চাহি,
'গোপন আর কিছু নাহি!'
কহিল আসি কাছে কাছে,
'কত যে কথা রটিয়াছে!'
পুলকে হাতে হাত রাখি
কহিল, 'বৃথা ঢাকাঢাকি।'
মালাটি করি অরপন
কহিল সুখে মুখ চুমি,
'পড়িল ধরা ত্রিভুবন,
পড়িনু ধরা আমি তুমি।'

১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে কল্পনার অন্য অনেকগুলি কবিতারও পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে এবং ঐ পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতা-রচনার কাল ও স্থান গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ' কবিতা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

এর ['এবার ফিরাও মোরে' রচনার] পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।... এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।......

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪

'বর্ষশেষ' কবিতা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে— ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিৎকে নাড়া দিয়ে গেল; আমি বুঝলুম, বেরিয়ে আসতে হবে।

—শান্তিনিকেতন পত্র

'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু।...... 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারি দিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!

খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক রিক্ত দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তার পরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ। সেদিনকার বৈশাখমধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধু ধু করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিল্‌মিল্ করছে, ঝাউ উঠছে নিশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ স্বরে— গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায় তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

—পত্র। ৪ কার্তিক ১৩৩৯

'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তিতে মুদ্রিত পাঠ হইতে কতকগুলি অনৈক্য দেখা যায়; সেগুলি হইল— প্রত্যেক স্তবকের শেষছত্রে 'সেই' স্থলে 'এই', দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে 'পরিতেছিলেম' ও অষ্টম ছত্রে 'গিয়েছে'।

ক্ষণিকা

ক্ষণিকা ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্ষণিকার পাণ্ডুলিপির সাহায্যে রচনাবলী-সংস্করণে বহু কবিতার রচনার কাল ও স্থান প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

'অবির্ভাব' কবিতা সম্বন্ধে কবি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছেন—

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' কবিতায় একটা কোনো অন্তরগূঢ় মানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা গৌণ; সমগ্র ভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে—সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তা হলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু আবির্ভাব কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এই যে, এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে, সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব — তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল। তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ— জীবনে বাণীর বদল হল, বীণায় আর-এক সুর বাঁধতে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখছি আর-এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হলেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।

—পত্র। ৪ অক্টোবর ১৯৩৩

মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের 'লীলা' খণ্ডে ক্ষণিকার 'ভীরুতা' 'মাতাল' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে — সংগতকে নহে, অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং

আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর 'লীলা' খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিস আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না; বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না। একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উন্টা করিয়া বুঝিতে হয়।

—ভূমিকা : কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর সপ্তম ভাগরূপে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলীতে ব্যঙ্গকৌতুকের প্রবন্ধ-ভাগ ও নাট্য-ভাগ বিভিন্ন অংশে প্রকাশিত হইল।

ব্যঙ্গকৌতুকের বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামে একটি নূতন রচনা সংকলিত হইয়াছে। ইহা প্রথম সংস্করণের বহু পরবর্তী রচনা বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

শারদোৎসব

শারদোৎসব ১৩১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি স্বয়ং বিভিন্ন উপলক্ষে শারদোৎসবের মর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংকলিত হইল।

১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয় উপলক্ষে কবি এই নাটকের 'ভিতরের কথাটি' শান্তিনিকেতন পত্রে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেন—

আগামী ছুটির পূর্বরাত্রে আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে। শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল; তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়তো ছেলেরা ঠিক বোঝে না।

সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে-পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ্য আছে। মিলন ঠিকমতো ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে। আমরা এই সংখ্যার শান্তিনিকেতনে অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্যসম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল; সভ্যতা শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ—এই জগতে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বিধিব্যবস্থা ধর্মকর্ম শিল্পসাহিত্য আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি। এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন, যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে-চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে, আপন জ্ঞান প্রাণ প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ Three Years She

Grew নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষে কবি লিখিতেছেন—

'প্রকৃতির নির্বাক্‌ ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘ-সকলের মহিমা তাহারই জন্য এবং তাহারই জন্য উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা, ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটা শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালোবাসার ধন; আর, যে-সকল নিভৃতনিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি; অর্থাৎ, যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন তাহা না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারি দিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে— সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু উৎসব-

গুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর— সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে; লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই-যে সুন্দরকে খুঁজিবার কথা বলা হইল সে কী? সে কোথায়? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা সৌখিন পদার্থ? এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রহিয়াছে।

শারোদৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই-যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই-যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই: প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর-তাহা উজ্জ্বল হয় না? বাধা কোথায় কাটে না? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়— তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া

লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য: আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়; কর্মকে এড়াইয়া, তপস্যায় ফাঁকি দিয়া, পরিত্রাণলাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নীচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন?… আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।… কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে।… এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী…

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ… শত দুঃখেরই দলে তাঁরে সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে…

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্তলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির

আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।

—শান্তিনিকেতন পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬

শারদোৎসবের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে সবুজপত্রে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ; ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে: সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই-যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে; ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

—সবুজপত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪

ভানুসিংহের পত্রাবলীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে (২৪ ভাদ্র ১৩২৯) কবি শারদোৎসব সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে— 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

—ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্রসংখ্যা ৫২

১৩২৯ ভাদ্রে কলিকাতায় শারদোৎসব-অভিনয়ের সময় উহার একটি 'ভূমিকা' কবি রচনা করেন। অভিনয়পত্রী হইতে নিম্নে তাহা যথাযথ মুদ্রিত হইল—

শারদোৎসবের

ভূমিকা

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত তো?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, এক রকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু! কিন্তু আবার কিসের! আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে! এ তো রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলছ? তা, তাঁর উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন; সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল পাত্র, এ-সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়ালমতোই চলেন।

রাজা। তা, হয়েছে কী? লোকটা পালিয়েছে নাকি?

মন্ত্রী। এক রকম পালানোই বৈকি। সভাপণ্ডিত-মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভনিশুম্ভ-বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। এ কথা হয়েছিল সেই মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কী সর্বনাশ! এ মানুষকে নিয়ে দেখছি আর চলল না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালিওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন, তা হলে তো এ বিভ্রাট ঘটত না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেছেন, এখন উপায়?

মন্ত্রী। কবি বলছেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোটো একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী ?

মন্ত্রী। তা তো বলতে পারি নে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিস ! এ কি পরিহাস না কি ?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয়, মহারাজ, এ দুর্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে ?

মন্ত্রী। নেই বললেই হয় !

রাজা। যুদ্ধ ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোনো রকমের রক্তপাত ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা ? পতন ও মূর্ছা ?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস ? বীররস ? করুণরস ?

মন্ত্রী। না, কোনোটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন তা শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হল ?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। এ কথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের ; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর-কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হাল্কা, ওই রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে।

রাজা। তা, ওই ছেলের দলকে ভালো করে শেখানো হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কী সর্বনাশ! তা হলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায় তা হলে তো ছেলেরা পেকে যাবে— ছেলেই থাকবে না। সেইজন্যে ওদের নাট্য শেখানোই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুশি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখব।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী, সহজে খুশি হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই-সব হাল্কা, এই-সব কাঁচা, এই-সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা খেতের আবার মূল্য কী? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই হলেই দেনা-পাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভনিশুম্ভ তা হলে এখন থাক্— আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তা হলে কবিকে একবার ডেকে দাও-না, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাকব কী মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজছেন।

রাজা। বল কী, তার শিক্ষা হল কোথায় ?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে ? সে কি হাত পা নেড়ে, গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে ? সে যে আনাড়ি।

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েছে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েছে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক পালার নটের দলও তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা, এ নিয়ে এখন পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই। তা হলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে, বেশি-কিছু আশা করব না, সুতরাং বেশি-কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকবে না। গোড়ায় একটা গান হবে তো ?

মন্ত্রী। হবে বৈকি। এই-যে, গানের দল আপনার পাশেই বসে।

—অনুষ্ঠানপত্র। শারদোৎসব ভাদ্র ১৩২৯

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় (১৩১৫) -উপলক্ষে কবি এই নাটকের জন্য একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, নিম্নে সংকলিত হইল—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি—
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

—ভারতী। কার্তিক ১৩১৫

ইংরেজি ১৯২১ সালে, শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, নূতন ভূমিকা ও চরিত্র লইয়া, 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে উহা প্রচলিত নাই।

চতুরঙ্গ

চতুরঙ্গ ১৩২১ সালের সবুজপত্রে 'জ্যাঠামশাই' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' এইরূপ নামে ও ক্রমে প্রকাশিত হয়। ১৩২২ সালে চতুরঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সবুজপত্রে প্রকাশিত অথচ প্রথম সংস্করণে বর্জিত অনেক অংশ ১৩৪১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়। ঐ পরিবর্জিত অংশ হইতে কয়েকটি বাক্য আখ্যানের পূর্বাপর সংগতি -রক্ষার জন্য বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৪র্থ-১৪শ পংক্তিতে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থেও রবীন্দ্র-রচনাবলীরই অনুসৃতি লক্ষ্য করা যাইবে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী